কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

...স ঘনাদা সংখ্যা

জুন ১৯৮৬

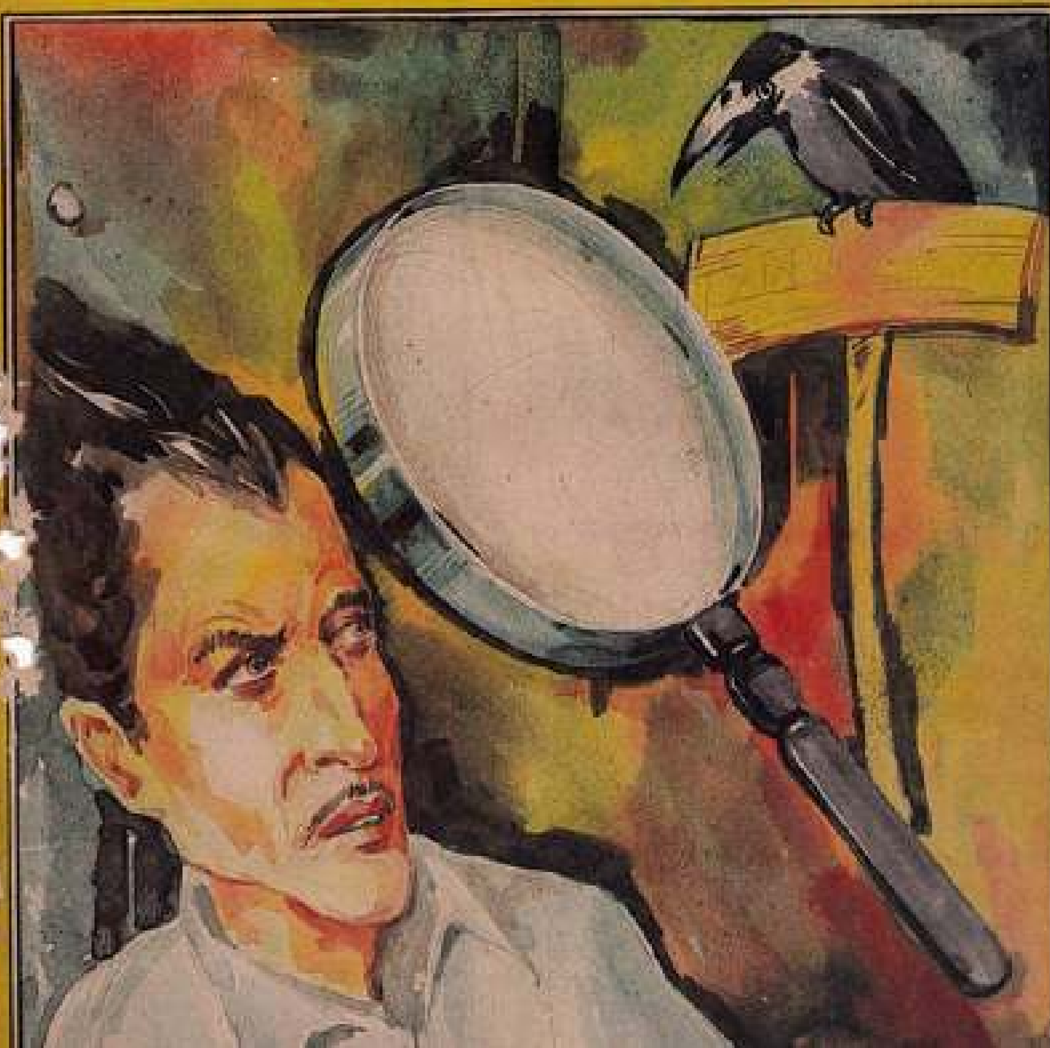

ষষ্ঠ বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা জুন '1986

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 : দপ্তর থেকে : ঘনাদা ক্লাব। সমরজিৎ কর 7

ঘনাদা বিষয়ক গল্প, ছড়া ও আলোচনা : ঘনাদার ভোজন বিলাস। লীলা মজুমদার 19 : বিজ্ঞানী ঘনাদা। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 39 : ঘনাদার বিশ্ব পরিক্রমা। সিদ্ধার্থ ঘোষ 29 : বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেন। অতসী সেন 27 : ঘনাদা ও মহাভারত। কিন্নর রায় 47 : ঘনাদা ও বিশ্বের নেতৃবর্গ। জয়ন্ত দত্ত 49 : অথ ঘনাদা জন্মকথা। পূর্ণেন্দু কিশোর ব্যানার্জি 72 : ঘনাদায়ন। অনিল কর্মকার 21 : ঘনাদার দেখা পাওয়া। অভিজিৎ দত্ত 30

বিশেষ রচনা : ঘনশ্যাম চরিতকথা। প্রেমেন্দ্র মিত্র 15

সাক্ষাৎকার : ঘনাদা এলো কোথা থেকে 10

ঘনাদার প্রথম গল্প : মশা। প্রেমেন্দ্র মিত্র : টীকা ও ব্যাখ্যা। ধরণী ঘোষ 31

ছবিতে গল্প : তেল। কাহিনী : প্রেমেন্দ্র মিত্র। চিত্ররূপ : গৌতম কর্মকার 23

বিভিন্ন শিল্পীর চোখে : অজিত গুপ্ত 10, 16 : অহিভূষণ মালিক 21 : নারায়ণ দেবনাথ 42 : ধীরেন বল 50 : ধ্রুব রায় 61 : প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় 34

পড়াশোনা : অভিস্রবণ। বিনোদকুমার দে 59 : পদার্থ বিজ্ঞানের কথা। অজয় চক্রবর্তী 60 :

রঙীন ফিচার : খরগোস। কার্তিকের দত্ত। কলম্বাসের বাহামা আবিষ্কার। কিন্নর রায় 12 : সিনিয়র কুইজ কনটেস্ট 14 : সিনিয়র ফোটো কুইজ 14 : পাদপাদপ। এণাক্ষী বিশ্বাস 55 : কোয়ার্জ। অমরনাথ রায় 56 : ঘড়ি আবিষ্কার। অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 57 : জুনিয়ার কুইজ কনটেস্ট 58 : জুনিয়র ফোটো কুইজ 58

ধারাবাহিক উপন্যাস : অমলধীয়ার রহস্য। নিরঞ্জন সিংহ 51

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য রচনা : পরিবেশ দিবসের ভাবনা। রবীন বসু 5 : বিজ্ঞান সংবাদ 17

ছোটদের দপ্তর : উত্তরদাতাদের নাম। 63 : নিজে নিজে কর। বাসুদেব সরকার 66
আইকিউ টেস্ট 63 : শব্দকুটের সমাধান 63 : ঘনাদাকুট। আশিস মাজা 64

প্রচ্ছদ : অলয় ঘোষাল : অন্যান্য ছবি। রেবতীভূষণ, গৌতম কর্মকার ও অলয় ঘোষাল
প্রধান সম্পাদক সমরজিৎ কর
সম্পাদক রবীন বল। সহসম্পাদক জয়ন্ত দত্ত

দপ্তর থেকে

ঘনাদা ক্লাব

সমরজিৎ কর

এ লেখার শিরোনাম দেখে তোমরা হয়ত চমকে উঠবে। বলবে 'দপ্তর থেকে' বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়েই তো বলা হয়। হঠাৎ ঘনাদা কেন? কে এই ঘনাদা?

ঘনাদা যে কে, আমার ধারণা অনেকেই তা জান। সেটা যে তেমন বেশি কিছু জানা তাও নয়। তাঁর বয়েস পঁয়ত্রিশও হতে পারে পঞ্চাশও হতে পারে—দেখে বোঝার জো নেই। আসল নাম ঘনশ্যাম দাস। সাহেবরা ডাকেন 'ডস' বলে। আর আমরা যারা বাঙালি তাদের কাছে 'ঘনাদা'ই যথেষ্ট। কলকাতা কর্পোরেশনের আঁকা-বাঁকা গলি বনমালী নস্কর লেন। এই গলির একটি জীর্ণবাড়ির ছোট্ট একটি চিলেকোঠার ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মত এসে তিনি আস্তানা গাড়েন। মেস বাড়ি। শিবু, গৌর এমনি নামের কয়েকটি যুবক সেখানে বসবাস করে। ঘনাদার দারুণ ব্যক্তিত্ব, কথার প্যাঁচ। সেই কথার প্যাঁচে তারা সবাই পরাজিত। তাদের উপর দিয়েই চলে ঘনাদার খরচ। তারা যে বিরক্ত হয় না সে কথা বলব না। তবু অদ্ভুত একটা ভয় এবং শ্রদ্ধাও ছিল সেই সঙ্গে। আসলে অদ্ভুত সেই মানুষটি সম্পর্কে কৌতূহলই কেমন যেন তাদের মেষ শাবকের মত করে দেয়। ঘনাদার জীবনের এক একটি ঘটনা শোনার ব্যাকুলতা নিয়ে প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষা করে তারা।

আর সে ঘটনাও কি কম? কি জানেন না ঘনাদা? পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যা তাঁর ঘোরা নয়। ডাকাতে মানুষ থেকে শুরু করে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী—সবাই তাঁর পরিচিত। মৃত্যুর মুখ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছেন কতবার, একটি 'মশা' অথবা পাথরের টুকরোর জন্যে সে কি কাণ্ড। এ সব গল্প শুনতে শুনতে শিউরে ওঠে তাঁর শ্রোতারা।

তা হলে আসল কথাটাই বলি। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার এবং কবি শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টি এই ঘনাদা। ঘনাদার মুখ দিয়ে তিনি অনেক গল্প শুনিয়েছেন আমাদের। গল্পের চরিত্রগুলি কাল্পনিক, কিন্তু প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে তিনি তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানের নানা রকম তথ্য, অনেক অজানা ঘটনা। গল্পের মধ্যে যেমন রয়েছে কড়া অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ, তেমনি বিজ্ঞান নির্ভর কথাবার্তা। আমরা তখন তোমাদের মতই কিশোর। গল্পগুলি সে সময়ে যখন প্রকাশ হতে থাকে সেগুলি পড়ে কি রোমাঞ্চই না পেয়েছিলাম। গল্পের ভেতর দিয়ে কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয় যে এত সহজ করে বলা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগে বাংলা ভাষায় আর কখনো ঘটে নি। ঘনাদার অ্যাডভেঞ্চার শুনতে শুনতে বিজ্ঞানের কত অজানা কথাই না আমরা মনের অজান্তে শিখে ফেলেছিলাম তখন।

এখন প্রশ্ন হল ঘনাদা ক্লাব তৈরি হল কিভাবে? প্রায় বছর দু'এক আগে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় তোমাদের প্রিয় লেখক সিদ্ধার্থ ঘোষ চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর চিঠির মূল বক্তব্য ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টি এই সর্বজনপ্রিয় ঘনাদাকে নিয়ে একটি ক্লাব গঠন করা। উদ্দেশ্য ঘনাদা চর্চা। যেভাবে ইংলণ্ড আমেরিকায় তৈরি হয়েছে শার্লক হোমস ক্লাব। সঙ্গে সঙ্গে এল আরো চিঠি সিদ্ধার্থ ঘোষকে সমর্থন করে। নতুন ভাবনাও সংযোজিত হল। অনেক পাঠক দাবি জানালেন শুধু বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প পাঠের আয়োজন করলেই চলবে না। চাই পুরোপুরি একটি সংস্থা—যা বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প পাঠের আয়োজনও করবে, আবার বিজ্ঞান বিষয়ক যাবতীয় কর্মসূচীও গ্রহণ করবে। বহুদিন ধরে অধিকাংশ পাঠকের সমর্থনে তৈরি হল কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ। সিদ্ধান্ত হল এই কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের দুটি শাখা হবে—এক : সায়েন্স ক্লাব বিভাগ, দুই : ঘনাদা ক্লাব। এই ক্লাবেরই প্রথম বৈঠক হয়েছিল স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। ক্লাবের উদ্দেশ্য, কিশোর কিশোরীদের মধ্যে ঘনাদার অনুকরণে গল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার। সে গল্প বড়রাও বলতে পারেন। তোমরাও বলতে পার। এতে করে অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানের অনেক ঘটনা যেমন তোমরা জানতে পারবে, ঠিক তেমনি কিভাবে মন টানার মত গল্প বলতে হয় তাও শিখতে পারবে। কল্পনা করার ক্ষমতাও বাড়বে সঙ্গে সঙ্গে।

শিল্পী রেবতীভূষণ অঙ্কিত

এ সব কথা ভেবেই 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর এবার-

কার এই বিশেষ সংখ্যাটি আমরা প্রকাশ করলাম। এই সংখ্যায় ঘনাদা সম্পর্কে অনেক লেখাও থাকছে।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম বৈঠক শেষে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন লীলা মজুমদার

আমরাও চাই তোমরাও বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লেখ। ঘনাদার অনুকরণেও গল্প বলতে পার। অথবা কল্প-কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে 'সায়েন্স ফিকশন'।

তবে হ্যাঁ, এই 'সায়েন্স ফিকশন' লেখার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ের উপর তোমাদের নজর দিতে হবে। মোটামুটি তিনটি বিষয়। এক। এ ধরনের লেখায় গল্পের সুর দরকার। থাকবে নানা রকম চরিত্র। থাকবে তাদের সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য এবং ব্যর্থতার কথা। যেমন থাকে সাধারণ গল্পে। দুই। গল্প পড়ে পাঠক-পাঠিকারা যাতে প্রতিমুহূর্তে কৌতূহল বোধ করে সে দিকটাও দেখতে হবে। তিন। সবচেয়ে যে বড় দিক সেটা হল, এ ধরনের গল্পে থাকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক। দেশে দেশে বিজ্ঞানে কত রকম গবেষণাই না চলছে। উদ্ভাবনের শেষ নেই। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান আরো কত ভাবেই না বিকশিত হতে পারে। এসব ব্যাপার যুক্তি এবং ব্যাখ্যা দিয়ে গল্পে এমনভাবে তুলে ধরা দরকার, যাতে করে পাঠকদের কাছে তা নেহাৎ না গালগল্প হয়ে দাঁড়ায়। পাঠকরা যাতে তা অবাস্তব বলে উড়িয়ে না দেয়। গল্পে এসব কথা বলতে গেলে বিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা দরকার।

উদাহরণ দিই। এখনকার নাম করা 'সায়েন্স ফিকশন' লেখকদের মধ্যে একজন আর্থার ক্লার্ক। একবার তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন 'সায়েন্স ফিকশন' লেখা শুরু করবার আগে আপনি কি কোন পরিকল্পনা করে নেন ?

ক্লার্ক বলেছিলেন, অবশ্যই করি। প্রথমে আমি গল্পের চরিত্রগুলি কেমন হবে, তা ঠিক করে নিই। আমার নায়ক হয়ত একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী। মহাকাশযান নিয়ে সে ভিন্ন গ্রহে যাত্রা করবে। চলার পথে তার কাজকর্ম এবং চিন্তাভাবনায় মহাকাশের পরীক্ষালব্ধ বিবরণ যাতে প্রকাশ পায় সেটা দেখতে হয়। মহাজাগতিক রশ্মি কি, গ্রহাণুর গতিপথ, চৌম্বক বেষ্টনীর বাইরে যাওয়ার সময় যন্ত্রপাতিতে কি ধরনের গোলযোগ ঘটতে পারে, নির্জন মহাকাশযানে দিনের পর দিন কাটাতে গিয়ে আরোহীদের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে, অথবা নতুন কিছু উদ্ভাবনা—এ সব এমন ভাবে বলতে হবে, যাতে পাঠকরা মনে করবে যা কিছু ঘটছে সবই সম্ভব। বাস্তবে তখনকার মত না ঘটলেও ভবিষ্যতে ঘটতে পারে। আজ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশন দেখান হচ্ছে, টেলিফোন করা হচ্ছে। 1946 নাগাদ এ সব সম্ভাবনার কথা একটি গল্পে বলেছিলাম আমি। তখন কৃত্রিম উপগ্রহের কথা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু পরে তা সত্যি হয়েছে তো ?

রবীন বলের সংযোজন :

বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প বা বিজ্ঞানের কল্প কাহিনী নেহাৎ আজগুবি অবাস্তব কিছু নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে ভবিষ্যতের নানা কল্পনার কথা থাকলেও তা কল্পনার চোখে বর্তমানকেই প্রক্ষেপ করে।

পৃথিবীর মহাকর্ষ ছিঁড়ে আজকের দিনে যে রকেট মহাকাশের বুকে পাড়ি জমিয়েছে তার লাঞ্চিং প্যাডের হদিশ কিন্তু দিয়ে গিয়েছিলেন অমর কথাশিল্পী জুলেভার্ন প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে। শুধু কি তাই, মহাকাশচারী ইউরি গাগারিনও ছোটবেলায় 'এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড' ইন এইট্টি ডেজ' পড়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবতেন—কবে তিনি আকাশের বুকে পাড়ি জমাবেন। তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় তথ্য আমাদের হাতেই রয়েছে। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক পাঠক-পাঠিকাই হয়তো তা লক্ষ্য করেছ। তবুও আর একবার বলি। জানুয়ারি সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান 'হ্যালির ধূমকেতু সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। লিখেছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গল্পকারগণ। তার মধ্যে একটি গল্প ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের। লেখা 'হ্যালির বেচাল'। ছিয়াত্তর বছর পরে মহাশূন্যের বিস্ময়কর জ্যোতিষ্ক হ্যালির ধূমকেতুকে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিজ্ঞানীদের চোখে ঘুম ছিল না।

চারটি সর্বাধুনিক মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিল হ্যালি পর্যবেক্ষণের জন্য। ভেগা-1, ভেগা-2, প্ল্যানেট A এবং স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান গিয়োত্তো। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেছিলেন হ্যালির ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ থেকে মাত্র 480 কিলো-মিটার দূরে দাঁড়িয়ে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ-যানটি তার নিরীক্ষণ কার্য চালাতে সক্ষম হবে। এই প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতেও প্রবীণ কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কল্পনার চোখে অন্য কিছু দেখেছিলেন। জানুয়ারি মাসে তাঁর 'হ্যালির বেচাল' গল্পে তিনি লিখেছিলেন, "কেপ গায়নার কোর্ট থেকে ছোড়া গিয়োত্তো হয়তো তাকে যা হুকুম করা হয়েছে তার চেয়ে আলাদা বেশি কিছু করে বসবে আর সেই ভুলের দরুণ এক হাজার কিলোমিটার দূরে থেকে তার খবর নেবার বদলে সে ধূমকেতুর মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে বসবে।" এই গল্প প্রকাশিত হবার একশ দিন পরে আমরা যখন কাগজে হ্যালি ও গিয়োত্তোর সম্পর্কের কথা জানতে পারি তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। প্রেরিত চারটি মহাকাশযানের মধ্যে গিয়োত্তোর সঙ্গে হ্যালির সংঘর্ষ প্রেমেন্দ্র মিত্র যে কল্পনার চোখে দেখেছিলেন, ভবিষ্যতে সেটাই ঘটে যাওয়া—কল্পনার চোখে ভবিষ্যৎ ইংগিতের কি একটা বড় প্রমাণ নয়?

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত প্রথম বৈঠক
বাঁদিকে নীলা মজুমদার ডানদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত ঘনাদা বিষয়ক দশটি প্রশ্নের উত্তর

1. ঘনাদার প্রথম গল্পের নাম—মশা।

2. নকল ইবন ফরিদের সঙ্গে ঘনাদার আলাপ হয়েছিল আদ্দিস আবাবায় যাবার পথে—এরোপ্লেনে।

3. ঘনাদার দাদার নেশা—নস্যি।

4. বাপী দত্তর খালি সীটে নতুন বোর্ডার নেওয়া হয়েছিল সুশীল চাকীকে।

5. ঘনাদার দ্বিতীয়বারের মহাকাশ যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন, উন্মাদ বিজ্ঞানী লুটভিক, সুরঞ্জন ও বটুক।

6. 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' হল টাকে চুল গজাবার একরকম তেল।

7. ই. ইউ. ডব্লিউ. সি এবং এম. বি. ডি. ও. ই. সঙ্কেত দুটির পুরো কথা হল: এনার্জি আন লিমিটেড ওয়ার্ল্ড কার্টেল এবং মিলিয়ন ব্যারেলস্ ডেইলি অয়েল ইকুইভ্যালেন্ট।

8. মহাভারতে নেই এমন অনেক ঘটনাই আমরা ঘনাদার মারফত জানতে পেরেছি যার জন্য কৌরবদের পরাজয় ঘটেছে। এখানে একটি ঘটনা বলা হল। যেমন দুর্যোধন কর্তৃক উলুকের উপর কমিশারিয়েটের দায়িত্ব অর্পণ।

9. 'পার্দাচিরুস মার্মোরেটাস' এক ধরনের হাঙর খেদানো মাছের নাম।

10. পেরুর ইন্‌কা সম্রাজ্ঞীদের 'কয়া' বলে অভিহিত করা হত। ঘনাদার পূর্বপুরুষ গানাদো' পেরু অভিযানে একটি মেয়েকে উদ্ধার করে নাম রাখেন 'কয়া'।

সাক্ষাৎকার

ঘনাদা এলো কোথা থেকে

ঘনাদা প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হরিশ চ্যাটার্জির বাড়িতে তাঁর মুখোমুখি দুপুরের রোদ, গরম এবং প্রেমেন্দ্রবাবুর শারীরিক অসুস্থতা—সব কিছুর মধ্যে এই সাক্ষাৎকার। শারীরিক নানা অসুবিধে আর চোখ নিয়ে খুব খারাপ অবস্থার মধ্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের প্রতিনিধি কিন্নর রায়কে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এজন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

প্রশ্ন: ঘনাদা নিয়ে লিখবেন এমন ভাবনা কিভাবে এলো, কোনো প্রস্তুতি... ?

উত্তর: আগেও বহুবার বলেছি, এখনও বলছি, ঘনাদা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা সে ভাবে কোনো দিনই মাথার মধ্যে দানা বাঁধেনি। সায়েন্স ফিকশান লিখতাম। মনে হলো বিজ্ঞানভিত্তিক এসব গল্প তো বানিয়ে লিখি, এমন একটা চরিত্র হক না, যে বানিয়ে বানিয়ে বলে। তারপর প্রথম গল্প দেব সাহিত্য কুটিরের ছোটদের পুজো বার্ষিকীতে বেরনোর পর আর থামবার উপায় নেই। পাঠকও ঘনাদা চায়, সম্পাদকও। আসলে কি জানো আমি ইতিহাস ভালোবাসি, ভূগোল—রোমাঞ্চকর অভিযান ভীষণ ভালো লাগে, বিজ্ঞান আমার খুবই প্রিয় বিষয়। এই যে তিন ভালোবাসার সমাহার, তাই ফুটে উঠেছে ঘনাদার মধ্যে। আমার নিজের ভালোলাগা পাঠকদের ভালো লাগবে বলে বুঝেছি। কি যে ভালোবাসে পাঠকেরা, তার প্রমাণ এদেশে যেমন পেয়েছি, বিদেশেও। আমেরিকা গিয়ে জানতে পারলাম বাঙালি পড়ুয়ারা খবর নেয়, দেবসাহিত্য কুটিরের পুজোবার্ষিকীতে ঘনাদা আছে কি না, থাকলে তারা অর্ডার বুক করে। একজন ইতিহাস পড়া, অনেক পণ্ডিত মানুষ, খুব বড় চাকরি করেন, তাঁর ছেলেকে ঘনাদা-কাহিনী বলেছিলেন, বাংলায় এমন গল্প লেখা হয়, ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। তুমি সব লেখাগুলো মন দিয়ে পড়বে। তবে পাঠকের সমাদর ছাড়া আর তেমন সমাদর কোথায় পেল বলো এসব লেখা! ঘনাদা অবশ্য অনূদিত হয়েছে গুজরাটি, হিন্দি এবং মালয়ালমে। ইংরেজিতেও।

প্রশ্ন: প্রথম ঘনাদা-কাহিনী কবে, কোথায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর: এও তো প্রায় সকলেরই জানা, তবু বলি প্রায় ষাট বছর আগে, বোধহয় 1928-29 সালে দেবসাহিত্য কুটিরের পুজোবার্ষিকীতে ঘনাদা নিয়ে প্রথম লেখা বেরয়। গল্পের নাম 'মশা'।

প্রশ্ন: ঘনাদা নিয়ে ভবিষ্যতে লেখার পরিকল্পনা কি?

উত্তর: অনেক কিছুই তো পরিকল্পনা আছে। কিন্তু পেরে উঠছি কই! একে তো শরীর খুব খারাপ। তার ওপর চোখে দেখতে পাই না, ব্ল্যাঙ্ক ফোল্ড লিখি। নিজের লেখা লাইন নিজেই বুঝতে পারি না। পড়ে দেয়ার লোক নেই। না পড়লে ঘনাদা লেখা অসম্ভব এতো জানোই। তবু হোমিওপ্যাথি ওষুধে চোখটা যদি একটু সেরে ওঠে তাহলে একটা বিশাল কাজ করার ইচ্ছে আছে। তোমরা তো জানো ঘনাদার গল্পে দুটো ব্যাপার—একটা ঘনাদার নিজের কাহিনী, অন্যটা ঘনাদার পূর্বপুরুষের নানা ঘটনা। ঘনাদার পূর্ব পুরুষদের নিয়ে একটা লেখার পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছে, তবে চোখ ঠিক না হলে হবে না। আর একটা রোমাঞ্চকর ভৌগোলিক অভিযান—যা আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় ভাষায় লেখা হয় নি, তার পটভূমিতে ঘনাদা-কাহিনী লেখার পরিকল্পনা আছে। সম্ভবত এটা একটা বহুদিন স্মৃতিতে থাকার মতো কাজ হবে।

প্রশ্ন: ঘনাদা কি শুধুই তরুণদের পড়ার? মানে জোর দিতে চাইছি ঘনাদা কি কেবলই কিশোর পাঠ্য—এই প্রশ্নের ওপর।

উত্তর: মোটেই না। ঘনাদা সব বয়েসের। ঘনাদা লিখে আমি এখনও আনন্দ পাই। আর সাত থেকে সাতাশি সবাই ঘনাদার পাঠক। তারা ঘনাদাকে চায়। আসলে কি জানো, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন ঘনাদা আছে, যে বাগাড়ম্বর প্রিয়, কল্পনায় অনেক সাহস দেখায়। আবার-বিজ্ঞান-মনস্ক, ইতিহাস-মনস্কও। সবার ওপর অভিযান প্রিয়।

শিল্পী অজিত গুপ্তের চোখে ঘনাদা

পৃথিবী খ্যাত ফটোগ্রাফার মঁসিয়ে সুন্তেল ঘনাদাকে প্রায় চুরি করে নিয়ে যাবারই প্ল্যান করেছেন। উদ্দেশ্য জোর করে ঘনাদার কাছ থেকে একটা মানচিত্র বুঝে নেওয়া। ঘনাদার বাঁদিকে বন্দুক ডানদিকে রিভলবার উঁচিয়ে ধরা...

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং-এর সৌজন্যে

ঘনশ্যাম চরিতকথা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাহাত্তর নম্বরের টঙের ঘরে যে মানুষটি হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হয়ে দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছেন, আর লম্বা চওড়া কথার প্যাঁচ-পয়জারে শিশির, শিবু, গৌর, আর গোটা বিশ্বভুবনকে নিজের হাঁটুর কাছে নামিয়ে এনেছেন, তাঁর বংশ পরিচয় সে'তো মৌর্য বা মুঘল যে কোনো সাম্রাজ্যের থেকেই মহিমময়।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে 'দাস হলেন ঘনাদা'-র কথা। সেখানে আমি লিখেইছিলাম 1502 সালে 10টি জাহাজ নিয়ে ভাস্কো-দা-গামা আসে কালিকটে জামোরিনকে শায়েস্তা করার জন্যে। কালিকট লুটে করে ছারখার করে দিল ভাস্কো। তারপর সেখান থেকে কোচিন যাওয়ার পথে যে সব জাহাজ ও সুলুপ লুট করে জ্বালিয়ে দেয়, তার মধ্যে একটি মকরমুখী পালোয়ার সদাগরী জাহাজ ছিল। যে জাহাজ সমতট থেকে সূক্ষ্ম কাপাস বস্ত্র নিয়ে বাণিজ্য করতে গেছিল ভৃগুকচ্ছে। সেখান থেকে ফেরার পথেই সর্বনাশ। ভাস্কো দা গামার পৈশাচিক আক্রমণে সে সদাগরী জাহাজের সমস্ত মাঝি মাল্লারই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় নি। রক্ষা পেয়েছিল একটি দশ বছরের ছেলে। জ্বলন্ত সওদাগরী জাহাজ যখন ডুবছে, তখন ছেলেটি কেমন করে সাঁতরে এসে ভাস্কো দা গামারই জাহাজের হালটা ধরে আশ্রয় নেয়। একজন মাল্লা তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে পৈশাচিক আনন্দে আরও ক'জনকে ডাকে ছেলেটিকে বন্দুকে ছুঁড়ে মেরে মজা করার জন্যে। কিন্তু সেকালের ম্যাচলক্ বন্দুকে। ছুঁড়তে গিয়ে বন্দুক ফেটে সেই লোকটাই পড়ে মারা। ঠিক সেই সময়ে তিনটে শুশুকের জাতের ডুগংকে জলের মধ্যে ডিগবাজি খেতে দেখা যায় জাহাজের কিছু পেছনে। দুটো ব্যাপার নিজেদের কুসংস্কারে এক সঙ্গে মিলিয়ে দৈবের অশুভ ইঙ্গিত মনে করে ভয় পেয়ে ছেলেটিকে আর মারতে তারা সাহস করে না। তার বদলে তাকে তুলে নেয় জাহাজের ওপরে।

1503 সালে ভাস্কো-দা-গামা লিসবন-এ ফেরবার পর ছেলেটি বিক্রি হয়ে যায় ক্রীতদাসদের বাজারে। সেখান থেকে দশ হাত ফেরতা হতে হতে একদিন সে কিউবায় গিয়ে পৌঁছয়। দশ বছর বয়সে ভাস্কো দা গামার জাহাজে যে এসেছিল সে তখন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জোয়ান। জুয়ারেজ নামে কিউবায় এসে বসতি করা একটি পরিবারের সে ক্রীতদাস।

এই হচ্ছেন ঘনাদা, আমাদের ঘনশ্যাম দাসের পূর্ব-পুরুষ ঘনরাম দাসের গোড়ার কথা। নিজ মুখে ঘনাদা তাঁর নানান অভিযান, কীর্তিকাহিনী, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, কিন্তু কখনও বলেন নি তাঁর বংশ পরিচয়ের কথা। এ ব্যাপারে তিনি প্রায় সনাতন ধর্মের স্বয়ম্ভু। দাস পদবী ঘনরাম নিজেই নিয়েছিলেন। পালোয়ার সদাগরী জাহাজে ভৃগুকচ্ছে বাণিজ্য যাত্রা দেখে মনে হয় তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই যাত্রা করেছিলেন। সেকালের তাম্রলিপ্ত, এখনকার তমলুক, বন্দর হিসেবে তো যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিল। তাঁর এই যাত্রা থেকে মনে হতে পারে, মনে হওয়া কেন, অনেকটা বোধহয় প্রমাণও হয়ে যায় প্রায় তিনি ছিলেন বঙ্গদেশের বাসিন্দা। আবার তাঁর অভিযান-যাত্রার মধ্যে যেন মনে হয় সন্দ্বীপের কথাও আছে, সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে তিনি গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে। কিংবা ছিলেন সেখানেও। তখনকার ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে বহু পরিবার পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যার বাসিন্দা হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পরিবার যেমন, প্রথমে উড়িষ্যা, পূর্ববঙ্গে, পরে পশ্চিমবঙ্গে। ঘনরামের বংশধর হিসেবে ঘনাদার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মেরও যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক।

ঘনশ্যাম দাস বর্ণে দ্বিজ হতে পারেন, ক্ষত্রিয় বংশেও তাঁর জন্ম হতে পারে। সওদাগরী জাহাজে সূক্ষ্ম বস্ত্র নিয়ে ঘনরামের ভৃগুকচ্ছে বাণিজ্য করতে যাওয়ার মধ্যে তাঁর বৈশ্য বংশজাত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

লাতিন আমেরিকার দ্বীপ-নগর টেনচ্‌টিটলান-এ অ্যাজটেকদের হাতে বন্দী কর্টেজ আর তার মুষ্টিমেয় সৈন্যবাহিনীকে উদ্ধার করেছিলেন 'গানাদো' ঘনরাম মস্তিষ্কের খেল্ দেখিয়ে। তিনি মন্ত্রের মতো আউড়েছিলেন বন্দী ডন কর্টেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে—'তোমায় রথ দেখাব বলেই ভেবেছি, রথও দেখবে কলাও বেচবে।' তারপর সত্যিই রথ দেখিয়েছিলেন 'গানাদো' ঘনরাম। রথের মত কাঠের মোটা তক্তায় তৈরি দোতলা সাঁজোয়া গাড়ি। সে ঢাকা সাঁজোয়া গাড়ির দুই তলাতেই বন্দুক নিয়ে ছিল

সৈনিকেরা। নিজেরা কাঠের দেওয়ালের আড়ালে তীর ধনুক আর ইঁট পাটকেলের ঘা বাঁচিয়ে নিরাপদে বন্দুক ছুঁড়তে লাগল শত্রুর ওপরে। এই কাঠের সাঁজোয়া গাড়ির নাম হলো মান্টা।

সেই মান্টা উদ্ভাবিত না হলে কর্টেজ আর তার মুষ্টিমেয় বাহিনী সেবার দ্বীপ-নগর টেনচ্‌টিটলান থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারত না। নতুন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশের ইতিহাসই হয়তো তাহলে পাল্টে যেত।

কর্টেজ নিজের কথা রেখেছিলেন। গানাদোকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে দামী দামী বহু উপহার সমেত সম্রাটের সওগাত বয়ে নিয়ে যাওয়ার জাহাজেই স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পাঠাবার আগে দাসত্ব থেকে মুক্তিপত্র লিখে দেবার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এখন তুমি মুক্ত মানুষ গানাদো। বলো কি নামে তোমায় মুক্তিপত্র দেবো? কি নেবে তুমি পদবী?

নাম আমার নিজের দেশের ছেলেবেলার দেওয়া ঘনরামই লিখুন—বলেছিলেন গানাদো—আর আমার বংশ যদি ভবিষ্যতে থাকে তাহলে এ ইতিহাস চিরকাল স্মরণ করার জন্য পদবী দিন দাস।

সেই মুক্তিপত্র নিয়ে ঘনরামের কিন্তু আর স্পেনে পৌঁছনো সম্ভব হয় নি। সোরাবিয়ার চক্রান্তে তাঁকে আবার হতে হলো ক্রীতদাস। তারপর পিজারোর সঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযানে পাড়ি দিলেন পেরুতে। সেখানেও ঘনরামের জয়জয়কার। সেখান থেকে ফিরে আসা। জাহাজের ডেকে মরণপণ সংগ্রাম ঘনরামের সঙ্গে সোরাবিয়ার। ঐ জাহাজের ডেকেই বান্দনী কন্যা। ঘনরাম উদ্ধার করেছিলেন তাঁকেও।

তলোয়ার চালাতে চালাতে জাহাজের একেবারে শেষে দুজন। ঘনরাম তাঁর তলোয়ারের খোঁচায় কাটা পাল দিয়ে চাপা দিলেন সোরাবিয়াকে, সোরাবিয়া ডুবে মলল সমুদ্রে।

ঐ জাহাজের কাপতেন সানসেদো যাঁকে শ্রদ্ধাভরে মুক্তি দিয়ে গুরু বলে বরণ করেন ঋষিতুল্য পরম পণ্ডিত সেই বৃদ্ধ ভারতীয় জ্যোতিষীর অন্তিম লিপি গানাদো অর্থাৎ ঘনরাম দাস যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। কাটোয়ার কাছে রামটপুর নামে এক গ্রামে, কৃষ্ণদাস নামে এক সজ্জনের কাছে। সেই বৃদ্ধ জ্যোতিষী এই রকম কিছু লিখেছিলেন, ···গণনায় জানতে পারছি 1455 শকাব্দের আষাঢ় মাস সমস্ত পৃথিবীর এক দুঃসময়। বিশ্বের অনন্য এক যুগাবতার তিরোহিত হতে চলেছেন ঐ সময়ে। পারেন তো সেই পরম জ্যোতির্ময় সত্তার দীপ্ত দিব্যোন্মত্ত জীবনকথা অমর কাব্যে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করুন। 1455 শকাব্দের আষাঢ় মাস হল 1533 খ্রিস্টাব্দের জুলাই। নীলাচলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে ঐ সময়েই।

যাক সে কথা, তাহলে দেখা যাচ্ছে দাস পদবী নিজেই নিলেন ঘনরাম। আর ঐ যে 'রথ দেখার' বলেছিলেন তিনি বন্দী কর্টেজকে, তা থেকে একটা কথা বেরিয়ে আসে। ছেলেবেলায় দেখা রথের স্মৃতিই হয়ত ঘনরামকে উদ্বুদ্ধ করেছিল একথা বলার জন্যে। আর রথ মানেই তো উড়িষ্যা, জগন্নাথের বিখ্যাত রথ। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে ঘনরামের ছোটবেলা হয়ত কেটেছিল উড়িষ্যাতেও। সেই রথযাত্রার স্মৃতি থেকেই তৈরি হলো দোতলা কাঠের সাঁজোয়া গাড়ি মান্টা—যা আধুনিক ট্যাঙ্কেরপূর্বপুরুষ।

ঘনরামের কথা ব্যবহার, ভেসে ওঠা স্মৃতি থেকে মনে হয় তিনি বঙ্গদেশ (পূর্ব এবং পশ্চিম), উড়িষ্যা আর মিথিলা—সমস্ত জায়গাতেই ছেলেবেলার কিছু কিছু অংশ কাটিয়েছেন। পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে তাঁর জীবনের সঙ্গে। তিনি পূর্বভারতীয় সংস্কৃতির ফসল। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর উত্তর পুরুষ ঘনশ্যাম দাস পূর্ব ভারতেরই মানুষ।

শিল্পী অজিত গুপ্তের চোখে 72নং বনমালী নস্কর লেনের একতলার খাবার ঘরে শিশির শিবু সুধীর গৌর ও ঘনাদা। ডানদিকে বনোয়ারি। Acute angle-এ খেতে বসে এখন abtuse angle-এ পৌঁছে ঘনাদার মেজাজ এখন শরতের আকাশের মতোই প্রসন্ন।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর সৌজন্যে

ঘনাদার ভোজনবিলাস

লীলা মজুমদার

ভাগ্যিস ঐ নাম দেওয়া হয়েছে, তাই আমি হাতে পায়ে অনেকটা জোর পাচ্ছি। কিন্তু সম্পাদক মশাই যদি বলতেন 'ভোজন-বিলাসী ঘনাদা', তাহলে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি কেটে নেওয়া হত আর সম্ভবতঃ আমাকে সেকালের সেই ধরথরিয়া না ধনুষ্টঙ্কারিয়া রোগ ধরত। অবিশ্যি ঘনাদার সেই বিখ্যাত ছাইয়ের এক চিমটি দিয়ে তখনি রোগ সারিয়ে ফেলতাম। মোট কথা ঐ দুটো শিরোনামার যে এক মানে হতে পারে না, সেটাই আমার এই সামান্য এবং অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাতেই প্রকট হবে। যদিও ঘনাদার নিজের ব্রহ্মাণ্ডাকৃতি—ইয়ে যাকে বলা যেতে পারে বানানো গল্পের কাছে সেটি বিচি বের করে দেওয়া পরমাণুর চেয়েও তুচ্ছ। আশা করি তোমরাও আমার সঙ্গে একমত যে বানানো গল্প আর মিথ্যা কথার মধ্যে কোনো মিল নেই। যে-কোনো সময়ে ঐ বানানো গল্পগুলোও অকাট্য সত্যি বলে প্রমাণ হয়ে যেতে পারে। হয়তো একটা শরণার, কি তুম্বুরের বিচির, কি ঐ রকম বিনম্রী ধরনের কিছুর সাহায্যে। তোমরা কি কর না কর তার দায়িত্ব নিতে আমি অনিচ্ছুক, কিন্তু আমি আমার জীবনের অনেকটা সময় খরচ করে ঘনাদার বিষয় যাবতীয় গল্প, উপন্যাস, চুটকি পড়েছি এবং সব বিশ্বাস করি।

সব কথা মনে আছে তা বলছি না। বি-এ ক্লাস অবধি অংক শিখেও তো তার তিনভাগ ভুলে গেছি। কিন্তু তাতে তো আর অংকের অ-নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ হচ্ছে না। এ-ও তাই। মোট কথা আমার বক্তব্য বিষয় হল ঘনাদার ভোজনে যথেষ্ট বিলাস থাকলেও তিনি আদৌ ভোজন-বিলাসী ছিলেন না। শুধু তাই নয়, কোন পাপিষ্ঠরা যে আসল দুষ্কৃতকারী সেটা প্রমাণ করে দেখারও আশা রাখি। 60 বছর ধরে মিছিমিছি কোন্যান ডয়েল থেকে অ্যাগাথা খৃস্টি, রেক্স স্টাউট, আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনারদের গুলে খাইনি।

তাছাড়া এই সামান্য ও ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যাতে ঘনাদার যোগ্য হয় তাই নতুন করে অফুরন্ত ঘনাদা, দুনিয়ার ঘনাদা, অদ্বিতীয় ঘনাদা, ঘনাদাকে ভোট দিন, ঘনাদার জুড়ি নেই, ঘনদা ও মৌকাসাবিস, এমন কি মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা মন দিয়ে পাঠ করে শুধু সময় নষ্ট করিনি। বরং অশেষ আনন্দ এবং আমার পুরনো মতামতের পূর্ণ সমর্থন পেয়ে নিরংকার না হলেও, নিশ্চিন্ত হয়েছি।

ভাবতে পারেন মাত্র এই সাতটি বইয়ের পরিধির মধ্যে ঘনাদা ল্যাটভিয়ার রিগা, নিউ হেব্রিডিজের মিকিউদ্বীপ, আফ্রিকার তৎকালীন বেলজিয়াম কংগো, হিমালয়ের হিমাঞ্চল, দক্ষিণ মেরু, ল্যাব্রাডর, মধ্য এশিয়ার বোদ্রেমে শহর, অস্ট্রেলিয়ার কাছকাছি বহু দ্বীপে, মায় মঙ্গলগ্রহে, মোটর বোটে, এরোপ্লেনে লাট্টু চেপে ও অন্যান্য অভাবনীয় এবং অপটুদের আপাতদৃষ্টিতে যাকে অসম্ভব মনে হতে পারে, এমনি সব উপায়ে, অথচ দেহে পৌঁছে এবং অল্পবিস্তর বেশ কিছুদিন কাটিয়েও, কোনো একটি জায়গার বাসিন্দারা কি কি খায়, কিভাবে সে-সব রান্না করে কিম্বা করে না, তার বিন্দুবিসর্গও জানতে দেননি। মঙ্গলগ্রহের মতো জলশূন্য প্রান্তরের তলাকার স্ত্রীজাতি অধিবাসিনীরা কি খেয়ে সম্ভাব্য স্বামী খুঁজে বেড়াত—এমন কি তাদের

হাতে নিজের হতভাগ্য দুই সঙ্গীকে নিশ্চিন্ত মনে ফেলে রেখে এসেও, খাওয়াদাওয়ার কথাটা চেপে গেলেন ! !

তোমরাই বল, 72 নম্বর বনমালী নস্কর লেনের ঐ পুরনো বাড়িতে রান্না করা, বা সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে ব্যবস্থা করা কলকাতার ভবানীপুরের বা কালিঘাটের উৎকৃষ্ট ভোজ্য ছাড়া, অন্য কোনো দেশের কোনো লোভনীয় খাদ্যের কথা আমাদের বলবেন না কেন ? এটা কি ভোজন-বিলাসীর মতো ব্যাভার হল ?

ভোজন-বিলাসী যিনি, তিনি নিজের হাতে পাক না করলেও, যারা করবে তাদের হাড়জ্বালানি ডিটেল সহকারে, রিপা বা মিকিউ বা কংগো বা বোদরুদের এবং বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহের পাক-প্রণালীর বিষয়ে প্রশিক্ষিত করতেন না ? ভোজন-বিলাসীদের ঐ করে কত সুখের সংসার ছারখার করে দিতে কি আমি দেখিনি ? অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে প্রথম জীবনে ঐসব করতে গিয়েই বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে এমন নিবান্ধব, পরিচর্যাবিহীন জীবন তাঁকে কাটাতে হচ্ছে।

ভোজন-বিলাসীরা অন্যের পছন্দকরা ভালো জিনিস পেলেই অপর্যাপ্ত পরিমাণে খেয়ে বসে থাকেন না। তাঁরা বড়ই উন্নাসিক হন যে-জিনিসটি যেমন করে রাঁধা উচিত, ঠিক তেমনটি না হলে তাঁরা ছোন না। নিজেরাও সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট পাচক হন। কি কি দরকার হবে, কি ভাবে রাঁধতে হবে, সব তাঁদের নখাগ্রে থাকে। মোটামুটি চালাক চতুর রাঁধুনে পেলে দেখতে দেখতে তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেন। রান্নাঘরের তাকে দুষ্প্রাপ্য মশলা মজুত থাকে। এক্ষেত্রে তার কোনো অসুবিধাও হবে না। কারণ দাম দেবে অন্যরা চাঁদা করে। তাঁদের দেখা পেতে হলে আগে টং-এর ঘরে না গিয়ে রান্নাঘরে যেতে হয়। প্রায়ই দোকানের খাবার তাঁরা পছন্দ করেন না। কারণ কোথাকার কি তেল ব্যবহার হচ্ছে, সেটা নিয়ে মন খুঁৎখুঁৎ করে। মন খুঁৎখুঁৎ করলে খাদ্য উপভোগে বাধা পড়ে।

যে খাদ্য উপভোগ করা যায় না, বিলাসী তা ছোন না। কিন্তু স্রেফ বোম্বাই শিক-কাবাব, ফিশ ক্রোকেট, হরি ময়রার বাদশাহী শিঙাড়া, কালিঘাটের তোতাপুলি ল্যাংচা, প্লেটের পর প্লেট নিঃশেষ করে দিচ্ছেন ঘনাদা, এ দৃশ্য বারবার দেখতে পাচ্ছি। খেতে ভালো হলেই খেয়ে ফেলেন। কোথায় কি ভালো মাছ, কি খাসির মাংস, কি হাঁস পাওয়া যায় জানতে পারেন ঘনাদা, কিন্তু তার বেশি সব ক্রিয়া নিশ্চিন্তে অন্যের হাতে ছেড়ে দেন। আমাদের সত্যিকার ভোজন-বিলাসী বন্ধু ছিলেন অধ্যাপক শাহেদ সুরাবার্দি। তিনি সারা ইয়োরোপ ঘুরে সব দেশের খাদ্য তালিকা ও প্রস্তুতপ্রণালী শিখে এসে একটা বইও লিখেছিলেন। তাছাড়া কাউকে নেমন্তন্ন করলে একটা পদ তিনি নিজে রাঁধতেন, সেটি নিজে পরিবেশনও করতেন। তার আগের তিন রাত নাকি দুর্ভাবনায় তাঁর ঘুম হত না। ভোজনবিলাসী হতে হলে ঘনাদাকেও ঐ রকম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গজাতে হবে। ঐ বইয়ের এককপি ঘনাদাকে দিলে হয়।

তবে আমাদের মতো গেরস্তমানুষের পক্ষে তিনি ভোজনবিলাসী না হয়ে, ভোজনে যে তাঁর বিলাস ছিল, সেই বরং ভালো। বিলাসটাও অসম্পূর্ণ ছিল। কই, চীনে খাবারের নাম পাইনে কেন ? অত বাংলাই আর হাক্ক-মোগ্‌ লাই ভাজাভুজির জিনিস খেলে, যাদের বয়স তিরিশের নিচে, তাদের কিছু না হলেও, মনে হয় ঘনাদাকে একটু সাবধান করে দিলে ভালো হয়। কেক, প্যাটি, পেস্ট্রি তো মেমসায়েবের বেয়ারা ঘরে ঘরে বেচতে আসত। এ-কথা তো ঘনাদার জীবনীকারের ধর্মপিতার না হক মর্মপিতার ভালো করেই জানা ছিল। তাছাড়া যারা মোকামে পর্যন্ত মাছের খোঁজে দৌড়তে পারে, তারা কালিঘাটের স্টপ থেকে নিউমার্কেটের স্টপ অবধি ট্রামে চেপে গিয়ে পুকুরপাড়ে নেমে দু-পা হেঁটে গেলে যেখানে পৌঁছোত, সেখানে সেকালে শুনেছি বাঘের দুধও মিলত।

ও-সব বাদ দাও। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি খাদ্য বিশারদ না হলেও মৎস্য-বিশারদ ছিলেন। দুঃখের বিষয়, অভাবনীয় বিপদের সামনে নিজের এবং অপরের প্রাণ নিয়ে যতই ছিনিমিনি খেলুন না কেন, খাওয়াদাওয়ার বেলায় দুরন্ত অভিযাত্রীর পথ ছেড়ে, গতানুগতিকের পন্থা আঁকড়ে থাকতেন। তবে এক পাতে বসে ইলিশমাছের ঝাল ঝোল অম্বল খাবার পর, বলে বসা, 'এটা মোটেই গঙ্গার ইলিশ নয় ; রূপনারায়ণের গন্ধ পাচ্ছি।' কিম্বা দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন বলে একবেলা নলীর সুরুয়া আর এক বেলা মুরগির সুরুয়া—অন্য সব কিছুর উপর খাওয়াটাও কিছু কম বাহাদুরি নয়। বাহাদুরি কেন, আমি বলব দারুণ দুঃসাহসিকতা। ভোজনবিলাসী না হলেও ভোজনে বিলাস ছিল তো। অম্বুরী তামাক খেতেন। শিশিরের ভালো সিগারেট হাজার হাজার ফুঁকে দিতেন। ভালো জিনিসের কদর না জানলে তাই কখনো করা যায় ? শুধু হাঙরের পাখনা চেখে দেখেননি কেন ? নিদেন দু-চারটে পাখির বাসা খেতে দোষ কি ছিল ?

এখন কথা হল ঐ সাতটি বইয়ের এবং আরো অনেকগুলি বইয়ের হীরো বা বীর নায়ক নিঃসন্দেহে ঘনাদা। কিন্তু, পাষণ্ড পাপিষ্ঠ শত্রু কারা ?

তাদের খুঁজতেও বেশি দূরে যেতে হবে না এবং সত্যি কথা বলতে কি 72নং বনমালী নস্কর লেনের ঐ বারোমেসে এবং প্রায় 24 ঘণ্টাব্যাপী ভোজনবিলাস যজ্ঞের মূলে তারাই। ঘনাদা তিন তলার ঐ নির্জন বিলাস-

বিহীন ঘরে বসে যে আলাদীনের স্বপ্নের ভাণ্ডারের চাবি খুলে দেন, যার ফলে খেলা দেখা, চাঁড়ুভাতি করা, কিচিঙ্গে গ্রামের অনুষ্ঠান, সব মুলতুবি হয়ে যায়, তার মদৎ যোগায় কারা ? তাদের নাম শিবু, শিশির, গৌর এবং বিশেষ করে ভিজে বেড়াল সুধীর এবং রামভুজ আর বনোয়ারি বলে দুটি মুখপোড়া হনুমান।

এতক্ষণ যে ভোজনবিলাসী আর ভোজনে বিলাসের মধ্যে প্রভেদ প্রমাণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলাম সেগুলোও এক রকম মানসিক বিলাস। সোজা কথা ঐ চারটে ছেলে দারুণ পেটুক এবং তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা, তারা জানে যে দুনিয়ার পেটুকপনার সুবিধা নিয়ে সবাইকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করানো যায়। এ ক্ষেত্রে ভালো খাইয়ে ঘনাদাকে দিয়ে সর্বদুষ্করা সব গল্প আদায় করা যায় এবং করা হয়ও। সেটাকে খুব খারাপ কাজ বলা যায় না, বরং অতিশয় ভালো। ঘনাদা তো আর বোকা নন যে ভালো জিনিসটে সামনে ধরে দিলে তার অপমান করবেন। দুর্নীতিপুষ্ট'ও নন যে খেয়ে তার দাম দেবেন না। পরিশেষে আমার সুচিন্তিত মত হল বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা হল ঘনাদার গল্প। এমন সরস ও জ্ঞানগর্ভ বই আর নেই। তার একমাত্র ত্রুটি ঘনাদা সোডা খেলেই ধরে হবে।

শিল্পী অহিভূষণ মালিকের চোখে ঘনাদা

ঘনাদা তখন ইচ্ছে করেই প্যারিসের একটা শস্তা হোটেলে রয়েছেন। সেখানেই হঠাৎ মঁসিয়ে লেভির সঙ্গে দেখা। মঁসিয়ে লেভির কাছ থেকেই তিনি জানতে পারলেন বোম্বেটার চক্রান্তের কথা। তেলের সঙ্কট তখন সারা বিশ্বে।

বাঁদিকে ঘনাদা ডানদিকে মঁসিয়ে লেভি।

আনন্দ পাবলিশার্সের সৌজন্যে

ঘনাদায়ন

অনিল কর্মকার

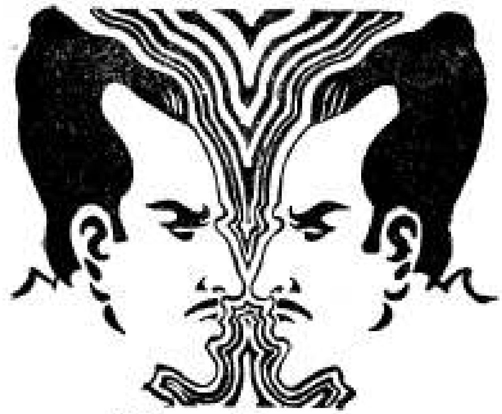

সময়ের সাথে যিনি অবিরাম পাল্লা লড়ছেন,
গম্বুজ খিলানের মণিময় সমারোহ গড়ছেন, তাঁর
নাম বলতো।

পৃথিবীর সব নদী এমন কি ভয়াবহ সাগরেও
যাঁর ভাসমান দেহ দেখে ভয়ে সরে যায় হাঙরেও,
তাঁর কাছে চলতো।

যাঁর কোন দেশ নেই পৃথিবীর সবখানে গিয়েছেন,
কোন জাতিভেদ নেই সকলকে কাছে টেনে নিয়েছেন,
তাঁর নাম জানো কি ?

পৃথিবীর সীমা ছেড়ে মঙ্গলগ্রহে তাঁর পদপাত,
মহাভারতের কালে একালীন নায়কের সংঘাত,
তাঁর কথা মানো কি ?

বিজ্ঞানে মানুষের এখনও যা বাকী আছে শেখবার,
তাঁর যাদু প্রতিভায় আর কিছু বাকী নেই দেখবার,
তাঁর জয়গান গাই।

পৃথিবীর নেতাদের চেয়ে যাঁর বুদ্ধিটা ধারালো,
অসম সাহস যাঁর সব কটি শত্রুকে হারালো,
তাঁর বাস কোন্ ঠাঁই ?

কোলকাতা নগরীর নমনীয় গাছের গলিতে
বাহাত্তরের এক বনমালী নস্কর গলিতে
টঙঘর আঁকিয়ে,

মৌরসীপাট্টায় মৌজ করে কতো যুগ রয়েছেন
আমাদের ভাগ্যেতে কতো রূপে শত কথা কয়েছেন
কল্পনা হাঁকিয়ে।

লোভন শ্রেষ্ঠের ভাকে মন তাঁর উড়ে উড়ে ছুটবেই,
পৃথিবীর সব দেশে ঢের ঢের শ্রোতা তাঁর জুটবেই
নেই কোন বন্ধন,

হেন একমেব যিনি অদ্বিতীয় তাঁর স্রষ্টা
যিনি একাধারে কবি এবং ভবিষ্য দ্রষ্টা
তাঁকে অভিনন্দন।

অথ ঘনাদা জন্মকথা

পূর্ণেন্দু কিশোর ব্যানার্জি

ঘনাদার নামে কাঁপে সর্বচরাচর
আর কার নাম আছে তাঁহার উপর ।
শীর্ণদেহ দীর্ঘনাক ড্যাবড্যাবে চোখ
প্রখর ব্যক্তিত্ববান নন সোজা লোক ।
চ্যালা ও চামুণ্ডা আছে গোটা তিন চার
প্রাণপণে সেবা তারা করে ঘনাদার ।
মুখরুচি খাদ্য পেলে বড় খুশি হন
রাগ গলে হয়ে জল হয় বিস্মরণ ।
চ্যালারা বেফাঁস কিছু কভু যদি করে
পাঠায় খাদ্যের ভেট ঘনাদার ঘরে ।
রামভুজ নিয়ে আসে চাপা দেওয়া ডিশ
কাটলেট হয়ে যায় নিমেষে ফিনিশ ।
কভু আসে ফিশরোল কভু আসে ফ্রাই
ঘনাদার মুখ চলে কোনো শব্দ নাই ।
শান্ত হলে মন তাঁর শান্ত হলে পেট
ভেট পান হাতে একটি সিগারেট ।
এরপর খোলে তাঁর মুখের আগল
সেসব কাহিনী শুনে হয়েছি পাগল ।
রহস্যে রোমাঞ্চে ঘেরা কত বিবরণ
কভু বা সমস্যা ছিল জীবন-মরণ ।
সকল সময়ে তাঁর সুনিশ্চিত জয়
শত্রু হেরে ভূত হয়ে মানে পরাজয় ।
লিখে কি ফুরাবে তাঁর জীবনের কথা
এবারে শোনাবো তাই জন্মের বারতা ।
নদীয়ার গঙ্গাধারে ইছাপুর গ্রাম
সেথা করিতেন বাস কবি ঘোঁচারাম ।
জাতিতে কায়স্থ তিনি গোত্র ভরদ্বাজ
তাঁহার দাপটে থাকে তটস্থ সমাজ ।
তেরশো তিরিশ সালে পূজার সময়
শোনো শোনো সবে সেকি কাণ্ড হয় ।
শুভদিনে সপ্তমীতে দ্বিপ্রহর গতে
কবিপুত্র নিল জন্ম পার্থিব জগতে ।
পুত্র দেখে ঘোঁচারাম আনন্দে অধীর
পাড়া প্রতিবেশী সব করে আসে ভীড় ।
কিছু দিনে হলো শেষ নিয়ম কানন
ঘনাদা জন্ম কথা করি বরনন ।
বারোমাস যেতে যেতে মুখে এল বুলি
লোকে গালে হাত দেয় শিরে চোখ তুলি ।
এরপর পিতা তাঁর রাখিছলেন নাম
কালো কোলো বলে নাম দ্যান ঘনশ্যাম ।
দেড় বছরে তাঁর হলো অন্নপ্রাশন
হাসিমুখে ঘনশ্যাম নিলেন আসন ।
মামা তাঁর মুখে তুলে দ্যান অন্নভাত
খাইয়া চেঁচিয়ে পাড়া করিলেন মাত ।
'মাছ কই মাছ' তিনি তীক্ষ্ণস্বরে কন
চপ ফ্রাই নাই দেখে বড় ক্ষুণ্ণ হন ।
এভাবেই শেষ হলো শুভ অনুষ্ঠান
তাঁহার জীবন কথা পাহাড় প্রমাণ ।
লিখে লিখে আর কতো দিব বিবরণ
এবারেতে হোক শেষ আমার কথন ।

লণ্ডনে গিয়ে পড়লে আজও লোকে 205 নং বেকার স্ট্রিটের (হোমসের আস্তানার) সন্ধানে বের হন। কিন্তু 'আত্মবিস্মৃত' কলকাতাবাসীদেরই কেউ কেউ হয়ত 'বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনে'র খবরটা তেমন রাখেন না। এতে অবশ্য ঘনাদার কিছু যায় আসে না, লজ্জাটা আমাদেরই।

ঘনাদার সঙ্গে আমার পরিচয় সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের (48)। কতই বা-বয়স তখন আমার, এক দু'বছর আগেও ত মুখস্থ হয়েছি 'পরীরা কেন আসে না' পড়ে! কিন্তু এ যেন এক নতুন চমক! মধুর ত বটেই, তবে মনোহারিত্বের চেয়েও অভিনবত্বের জৌলুসটাই যেন বেশি।

আড্ডা আর মেস এ দুটোই আজ অবলুপ্তপ্রায়। সংরক্ষণের কল্পনাও কেউ বিশেষ করেন না। কিন্তু সে সময়ে তারা উভয়েই বেশ বহাল তবিয়তে বিরাজ করত! মনে আছে সেদিন কৌতূহল হয়েছিল মেসবাড়িটার হদিশ খুঁজে বের করার। তখন ত আর জানি না যে 'মেসবাড়ির ঠিকানাটা সঠিক নাও হতে পারে' (16)। মনে আছে কত তত্ত্বতল্লাসী চালিয়েছি 'পথ-নির্দেশিকা'র পাতায় পাতায়, গুন্ড বালিগঞ্জের 'বনমালী বিদ্যাসাগর লেন' থেকে শুরু করে বি. টি. রোডের ধারে 'বনমালী চ্যাটার্জী স্ট্রিট' সবাই আছেন পাতা ভরিয়ে শুধু পাতা মেলে না 'বনমালী নস্কর লেনে'রই। 'সরোবর সান্ধ্যসভা'র উল্লেখানুসারে (62) 'বাটালিঘাট' এর (বালিগঞ্জ - টালিগঞ্জ—কালিঘাট) সর্বত্রই সন্ধান চালিয়েছি, কিন্তু কোথায় 'সেই ট্রাম, বাস, লরী মোটর, রিক্সা, ঠেলা আর মানুষের ধাক্কায় টলতে টলতে ছিটকে পড়া নোংরা, সরু, আঁকাবাঁকা গলিটা, (আর কোথাওই বা) সেই উপচে পড়া ডাস্টবিন আর ঘুঁটে লেপটানো পোড়ো বাড়ির দেয়াল বাঁচিয়ে একবার ডাইনের খাটালের সুবাসে আর একবার বাঁয়ের টিনের কারখানার ঝাঁপতাল সঙ্গীতে দিশাহারা হয়ে খাপরা আর টিনের চালের বস্তির মধ্যে থমকে দাঁড়ানো, বেরূপ, বেমানান পলস্তারা-খসা সেকেলে বাড়িটা" (15)।

রাস্তারই যেখানে হদিশ মেলে না, পাত্তা মেলে না 'কাছাকাছি নীলমণি বাজার' টারও (37), সেখানে 'বাহাত্তর নম্বরে'র খোঁজ করাটা ত বাতুলতা মাত্র। কিন্তু 'ঘরেতে এল না সে ত, মনে তার নিত্য আনাগোনা'র মতই দিনের পর দিন কল্পলোকে পেখম মেলতে থাকে "না নূতন, না পুরাতন, শক্ত ছাদের একটিমাত্র ত্রিতল নাতিপ্রশস্ত গৃহযুক্ত অট্টালিকা"টা (27)। 'বেশ বয়স্ক বাড়ি' (47) "বাড়িটার অনেক দিন ধরে পুরোপুরি সংস্কার হয় নি। খাপছাড়া তালিমারা এখানে ওখানে একটু আধটু মেরামত হয়েছে মাত্র" (10)।

'বাইরের দরজা তো হাট করে খোলাই থাকে। পুরনো আমলের খিলেন দেওয়া দেউড়ি" (5) "নিচে রান্নাঘর, ভাঁড়ার আর খাবার ঘর' (44)। বাসিন্দা দুজন (একটি মাত্র গল্পে (63) উল্লিখিত লছমনিয়াকে বাদ দিয়ে), বনোয়ারী—যার কাজ রকমারী সুখাদ্য সময়ে বয়ে আনা, আর রামভুজ রামভূষণ (2) নয়, ওটা ছাপার ভুল)—পাচক চূড়ামণি যার রান্নায় যাদুর হাত। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই 'দোতলার আড্ডাঘর। বেশ বড় ঘর। ঘরের মাঝামাঝি একটি আরাম কেদারা, ভাল আয়না গোটা দুই ও গোটা তিনচার চেয়ার। ডানদিকে পেছনে বাইরের বারান্দায় যাবার বড় দরজা। বারান্দায় রেলিং ও আরো দূরে ওপরে ছাদে ওঠবার ন্যাড়া সিঁড়ি (41) 'তেতালায় ন্যাড়া ছাদের ঘর' (27), 'ঘরে একটা মাত্র জানালা' (52)। আসবাব বলতে 'কেরোসিন কাঠের শেলফ' (10 আর 'একটা ভাঙ্গা তক্তাপোষ' (ঘনাদা এলেন)। 'জিনিসপত্র বলতে সাধের গড়গড়াটি বাদে একটি ছোট কম্বল জড়ানো বিছানা ও একটি পুরনো রঙচটা ডাউন তোরঙ্গ। সেই তোরঙ্গটি সকলেরই অত্যন্ত কৌতূহলের বস্তু। তার ভেতর

কি যে আছে আর কি যে নেই, এ নিয়ে বহুদিন অনেক গবেষণা, তর্কাতর্কি হয়ে গেছে। কারুর সামনে কোনদিন এ তোরঙ্গ খুলতে ঘনাদাকে দেখা যায় নি। নিন্দুকেরা তাই এমন কথাও বলে থাকে যে, তোরঙ্গটি ঘনাদার গল্পেরই চাক্ষুষ রূপ। ওর ভেতর থেকে ঘনাদা না বার করতে পারেন এমন জিনিস নেই। কিন্তু আসলে ওটি একেবারে ফাঁকা' (48)।

'কেন যে কৃপা করে তিনি এই গলিটির ছোট্ট মেসে এসে উঠেছেন তা ঠিক বলতে পারি না' (48)। কিন্তু 'এই এঁদো গলির ঝরঝরে হাড়গোড় ভাঙা বাড়ির বদলে বড় রাস্তায় প্রকাণ্ড ঝকঝকে নতুন বাড়ি পাওয়া সত্ত্বেও ঘনাদাকে অনুরোধ, উপরোধ যুক্তিতর্ক, প্রলোভন কিছুতে টলান যায় নি। তাঁর ধনুকভাঙা পণ, ওই তেতালার ঘর ছেড়ে পাদমেকম ন গচ্ছামি' (15)।

বোর্ডার বলতে আমরা অবশ্য গৌর ওরফে গৌরাঙ্গ (38, শিবু শিশির আর সুধীরকেই কেবল চিনি। সুধীরই এই কাহিনীগুলির লিপিকার। নাম জাহির করার চেয়ে 'আমি' সর্বনামের আড়ালে আত্মগোপন করতেই সে বেশি ভালবাসে। তবে বিনয়ী হলেও, দুটি ঘটনা সম্পর্কে যে তার কিছুটা বিভ্রান্তি ঘটেছে সে কথাটা না জানালে সত্য গোপন করা হবে। তার একটি, সপ্তাহান্তিক ছুটিভোজের দিন তারিখে—শনিবার (6) না শুক্রবার (63)। সেটায় না হয় সে ইচ্ছে করেই গোলমাল বাধিয়ে রেখেছে। যাতে রবাহূত কেউ গিয়ে ঝামেলা না বাধায়। কিন্তু ঘনাদার অনুপস্থিতির কার্যকারণটায়? 'পবিত্র সরাই'এ পাঁচদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকার আগে যে 'একবারই (তিনি) এ আস্তানা ছেড়ে ছিলেন' (14) কথাটায় কোন ভুল নেই। কিন্তু সেটা শিবুর জন্যে (33), 'বাপী দত্তের সময়ে' (14) নয়— তখন 'তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন নিজের তেতলার ঘরে' (61) যেমন আত্মনির্বাসন আগেও নিয়েছেন (26)।

ঘনাদার অনুপস্থিতিতে তাঁর তথাকথিত দাদা (13) ছাড়া তিন তিনবারই যে নতুন বোর্ডার নেওয়া হয়েছিল তা সে বিশ্বাড়ি হাঁসে অরুচি ধরানো বাপী দত্তই হোক (63, 61) কি ছাপার মালিক সুশীল চাকী (24) বা ধনু চৌধুরীই (17) হোক কেউই টিঁকতে পারে নি।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাদে (1392) এতদিনে জানা গেল যে, সুবিধা মতন বাড়ি পেয়ে শিশির, শিবু, গৌর আর সুধীর (আমি) মিলে (যখন) সেখানে একটা শহুরে আস্তানা বানাবার ব্যবস্থা করেছিল, (তখনই) একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগসহ (দুদিনের জন্যে) ঢুকে পড়েছিলেন ঘনাদা' (ঘনাদা এলেন)। সে 'দুদিন' অবশ্য এই চল্লিশ বছরেও ফুরোয় নি। যতদিন না ফুরোয় ততদিনই আমাদের লাভ।

ক্রমিক সংখ্যাগুলি 'গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাহিনীসমগ্র' থেকে উদ্ধৃত।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাহিনী সমগ্র

সংকলন—অতসি সেন

১।	আগ্রা যখন টলমল	২।	আঠারো না উনিশ
৩।	কাঁচ	৪।	কাঁটা
৫।	কাদা	৬।	কেঁচো
৭।	কীচক বধে ঘনাদা	৮।	কুরুক্ষেত্রে ঘনাদা
৯।	খাণ্ডবদাহে ঘনাদা	১০।	গান
১১।	গুলই ঘনাদা	১২।	ঘড়ি
১৩।	ঘনাদা কুলপি খান না	১৪।	ঘনাদা ফিরলেন (ঘনাদার গুল)
১৫।	ঘনাদাকে ভোট দিন	১৬।	ঘনাদার চিঠিপত্র ও মৌকাসাবিস
১৭।	ঘনাদার [illegible]	১৮।	ঘনাদার ফুঁ
১৯।	ঘনাদার শংকা সমাচার	২০।	ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্
২১।	ঘনাদার বচন এক, দুই, তিন	২২।	চোখ
২৩।	ছড়ি	২৪।	ছাতা
২৫।	ছুঁচ	২৬।	জল
২৭।	জয়দ্রথ বধে ঘনাদা	২৮।	টঙ
২৯।	টুপি	৩০।	ঢিল
৩১।	তেল	৩২।	তেল দেবেন ঘনাদা
৩৩।	দাদা	৩৪।	দাস হলেন ঘনাদা
৩৫।	দাঁত	৩৬।	ধুলো
৩৭।	নাচ	৩৮।	নুড়ি
৩৯।	পরাশরে ঘনাদায়	৪০।	পোকা
৪১।	পৃথিবী যদি বাড়ে?	৪২।	পৃথিবী বাড়ল না কেন
৪৩।	ফুটো	৪৪।	বেড়াজালে ঘনাদা
৪৫।	ভারত যুদ্ধে পিঁপড়ে	৪৬।	ভাষা
৪৭।	মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা	৪৮।	মশা (১৩৫২)
৪৯।	মাছ	৫০।	মাছি
৫১।	মাটি	৫২।	মাপ
৫৩।	মুলো	৫৪।	মৌকাসাবিস ও একবচন ও বহুবচন
৫৫।	মৌকাসাবিস ও ঘনাদা	৫৬।	মৌকাসাবিস থেকে বলোবালাই
৫৭।	রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন	৫৮।	লাট্টু
৫৯।	শান্তি পর্বে ঘনাদা	৬০।	শিশি
৬১।	সুতো	৬২।	সূর্য কাঁদলে সোনা
৬৩।	হাঁস		

॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ ॥

কি যে মতিভ্রম হয়েছিল, সম্পাদককে বলেছিলাম, পৃথিবীর একটা আউট লাইন ম্যাপ কিনে রাখবেন! একবারও তখন ভাবিনি এমন ফ্যাসাদে পড়ব। ভাবা উচিত ছিল। ভূগোল হাটকানো বিদ্যের জোরে টক্কর দিতে গিয়ে বাহাত্তর নম্বরের ওদের কি হাল হয়েছে সে তো জানাই।

পৃথিবীর আউটলাইন ম্যাপটায় ফুটকি বসানোর দরকার কি! এক শিশি কালি ওর উপর উল্টে দিলেই তো কম্মো সাবাড়। ফুটকি বসালেও যা হবে, কালি ঢাললেও তাই। অভিযাত্রী ঘনাদার পদচিহ্ন ওইটুকু ম্যাপের মধ্যে বসাতে গেলে সেটাই ঘটার কথা।

পৃথিবীর অংশ ধরে ধরে 'রিডার্স' ডাইজেস্টের অমন সব পাতা জোড়া ম্যাপ, সেগুলোও দেখছি ঘনাদার বিশ্ব-পর্যটন কভার করার পক্ষে নেহাতই ছেলেখেলা।

কোনো ম্যাপেই কাজ হবে না। হবে কি ক'রে? কমা আর ড্যাশ-এর নাম কি কেউ লিখেছে কোথাও? রয়্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটিতে খোঁজ নিলেও কেউ বলতে পারবে না। উঁহু, ঘনাদা নিজে গেছেন সেখানে, ফেলা ছড়িয়েছেন, কাজেই থাকতেই হবে। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে তো বনমালী নস্কর লেনকেও অবিশ্বাস করতে হয়! কলকাতার কোনো স্ট্রিট গাইডে নামটা নেই বলে অবিশ্বাস করবে যারা নেহাৎই আহাম্মক। তাই যদি কেউ বলে, তাহলে তাকে বিনীতভাবে না জানিয়ে উপায় নেই যে, কোনো রেলওয়ে টাইম টেবিলে বা হাওয়াই আড্ডার ফর্দেও কিন্তু কলকাতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ওই কমা আর ড্যাশের ব্যাপারটাও তো তাই। নীল সমুদ্রের অসীমতায় মাটি বালি আর পাথরের ফোঁটা মাত্র। তাও তার মালিকানা আবার ব্যক্তিগত। ভূগোলের বইয়ে বা মানচিত্রে ঠাঁই পাবে কি ক'রে। তবে ভার্জিন আইল্যান্ডস নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যায়—ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে বড় ছোট থেকে নেহাত ফুটকির মত সব দ্বীপের মিছিল একটু বাঁকা অর্ধচন্দ্রাকার রেখায় গ্রিনিডাড হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা ছুঁই ছুঁই করছে, তারই মধ্যে দেখা মেলে। এই শ'খানেক দ্বীপের সমষ্টির মধ্যেই দুটি—কমা ও ড্যাশ।

এই রকম ম্যাপে খুঁজে পাওয়া যায় না বহু দ্বীপই ধন্য হয়েছে ঘনাদার আগমনে। ভূগোলে যাদের ঠাঁই নেই, ইতিহাসে তাদের স্মরণীয় করে তুলেছেন ঘনাদা। অ্যালবার্ট মার্শাল মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের কাছে ক্যারোলাইনের একটি অ্যাটল এমন এক জায়গা—অকূল সমুদ্রের মাঝে প্রবাল দিয়ে গড়া একটা গোলাকার স্থলের বলয়ের মাঝখানে স্বপ্নের মত সায়র। কিম্বা লিমু আর নিকা, টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে এমন দুটি ফুটকি, সাধারণ ম্যাপে অণুবীক্ষণ দিয়েও যাদের পাত্তা মেলে না। "পৃথিবীর ভূগোল কোনো দেবতার হাতের কেরামতি যদি হয়, তা হলে আলাস্কা থেকে পূর্ব সাইবেরিয়া আঁকতে যাবার সময়ে অসাবধানে তাঁর তুলির কিছু ছিটে প'ড়ে" এই সব বালির দানার মতো দ্বীপের সৃষ্টি।

তা বলে কেউ যদি মনে করে ঘনাদা শুধু বেপট জায়গাতেই দাপটে ঘুরেছেন—সে কিন্তু জানে না। দুনিয়াময় টহলদারি করছেন তিনি দু'শ বছর ধরে। নামী দামী জায়গাই বা বাদ পড়বে কেন। দুশমনরা কি বিখ্যাত শহরে গা ঢাকা দেয় না। ঘনাদা ইংলন্ডের ক্রয়ডনে পুলিশকর্তার গেস্ট হয়েছেন, প্যারিসে বেশ একটা গরিব পাড়ায় নেহাত শস্তা হোটেলের টঙের একটা অখাদ্য ঘরে বাস করেছেন, নিউ ইয়র্কেও একাধিক বার পদার্পণ ঘটেছে—বিশেষ ক'রে সেখানকার ইয়ট্‌স্‌ ক্লাবে-ই শুরু হয়েছিল তাঁর তৈল শাসনের কাজকর্ম। ওয়াশিংটনেও গেছেন তিনি, না হ'লে মেরিল্যান্ডে পৌঁছবেন কি করে। বের্‌লিন ও ভিয়েনাতেও গেছেন তিনি কিন্তু সেখানে তাঁর ডাইক্রোমেটিক ও স্কোটোরিথ্‌মে্‌ ভিসনের সুরাহা হয় নি। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শহর অগুন্তি, হিসাবের বাইরে। ল্যাটভিয়ার রিগা, আদ্দিস আবাবা (যে-শহরকে তিনি গন্ধে ভালবেসেছিলেন, পোড়া ইউক্যালিপ্‌টাস কাঠের গন্ধে), সুদানের খার্তুম, কায়রো, লিব্রেভিল (গ্যাবো), জোহানেস-বার্গ, পেরুর লিমা, কিউবার সান্তিয়াগো, হাইতির ক্যাপ হাইতিয়েন, ত্রিনিদাদ, জর্জ টাউন (বৃটিশ গিয়েনা), সোয়ালো

ইস্রাওশে ও রেই-বোথা (বিরক্তির), ডালাস, হংকং—কত আর নাম করব।

ঘনাদার ভৌগোলিক অভিযানের বৃত্তান্ত লেখার আরেক অসুবিধা তাঁর দু'শ বছর ধরে পরিক্রমা কালে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রের অদল বদল। বিশেষ করে আফ্রিকার ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি। ঘনাদা হয়তো গিয়েছিলেন কঙ্গোয়, এখন সেটা জাইরি।

আমার বন্ধু শিবুর বাড়িতে তিরিশ বছর ধরে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকা আসছে। তার জন্য খুব গর্ব তার। কিন্তু সেদিন দুঃখ করে বলছিল, ঘনাদার কথা আজ অবধি ওরা একবারও ছাপল না। অবশ্য না-ছাপার কারণটাও শিবু বোঝে না যে তা নয়। ন্যাশানাল জিওগ্রাফির ভাল ফোটোগ্রাফ ছাড়া লেখা ছাপে না কিন্তু এমন ফোটোগ্রাফার কোথায় যে ধু-ধু এক মরুভূমির মাঝখানে সমুদ্রের বাড়িয়ে ধরা নুলোর মত এক উপসাগরে ঘনাদা যখন ছিপ ফেলে বসে আছেন, তখন তার ছবি তুলবে? সাইনাই মরুভূমির গাল্ফ অফ আকাবায় সময় মতো পৌঁছতে পারবে কি!

তাছাড়া এক একবারের অভিযানে ঘনাদা প্রায় অর্ধেক পৃথিবী চক্কর মেরেছেন। যেমন, দুনিয়ার সবচেয়ে দামী রোগ চিকিৎসার পুঁথি জুদশী-র জন্য সেবার তিনি নিউইয়র্ক থেকে স্যান ফ্রান্সিসকো, টোকিও থেকে লণ্ডন, প্যারিস থেকে রিও দা জানেরো ঘুরে বেড়ালেন। আরেক-বার, নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা শুরু করে, পেরুর লিমা হয়ে ভাড়া করা স্লুপে গ্যালাপাগস—স্কুনারে হাওয়াই—হাওয়াই থেকে ব্রিগ্যানটাইনে সামোয়া, সামোয়া থেকে কেচ-এ বারাটোঙ্গা, তারপর ইয়েল-এ ফিজি, ফিজি থেকে আবার স্লুপে নিউগিনির পোর্ট মোরেস-বি। বোঝাই যাচ্ছে কেন ঘনাদা-র পদাঙ্কানুসরণ করার চেষ্টা না করে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কলম্বাস—টলম্বাসদের নিয়েই পাতা ভরাচ্ছে। সহজে বাজিমাত!

থার্মোমিটারের পারদ যেখানে বাষ্প হয়ে যায় এমন জায়গায়ও গেছেন ঘনাদা। কালাহারি মরুভূমি পার হয়েছেন, সুমাত্রার এক পাশে। বুকিত বারিসান পর্বত-মালার বিশাল আগ্নেয়গিরির চূড়ো থেকে বিষাক্ত গ্যাসের বেঁধে ছাড়া ফেলে দিয়েছেন, গেছেন সাইনাই মরুভূমিতে।

গ্রীনল্যাণ্ডের সবচেয়ে দক্ষিণের ঘাঁটি ফেয়ারওয়েল অন্তরীপ থেকে হাজার মাইল দূরে যেখানে পারা জমে যায়, এমন জায়গাও বাদ যায় নি। এভারেস্টের মাথায় টুপি রেখে দেওয়া আর এমন কি ঘটনা, তার চেয়েও মারাত্মক যে ওই মিয়াকনু, তাও দমাতে পারেনি তাঁকে। সাইবেরিয়ার সেই টাইগা অঞ্চলেও টক্কর দিয়েছেন। হারপুন ছোঁড়া কামান চালক হয়ে তিমি শিকারে বেরিয়ে দক্ষিণ মেরুর ক্যাম্পবেল দ্বীপে ঘাঁটি গেড়েছেন।

পাহাড়ে পাহাড়েও কত টহলদারি। অ্যান্ডিজ পাহাড়ের চূড়োয় উঠেছেন, ঈ‍রোতি ধরতে এভারেস্টে দিয়েছেন হানা।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, রাশিয়া, ইউরোপ সর্বত্রই গেছেন তিনি কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশি তাঁকে টেনেছে আফ্রিকার আর দক্ষিণ আমেরিকার রহস্যময় জঙ্গল, আর দুই মহাসাগর—প্যাসিফিক ও আতলান্তিকের ছিটে ফোঁটা বহু দ্বীপ। তুলনায়, সোসালিস্ট দেশগুলোয় তাঁর তেমন যাবার দরকার পড়ে নি। যেমন, আলবেনিয়া, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড কি রুমানিয়া। হয়তো দুর্বৃত্তরা এখানে খুব পাত্তা পায় না তাই। রাশিয়ায় দু'একবার গেছেন কিন্তু দুশ দুশমনদের মোকাবিলায় নয়। ফরমোজায় যেতে হয়েছে তাঁকে কিন্তু মূল চীন ভূখণ্ডে যান নি। যান নি মানে, কাজে যান নি। বেড়াতে নিশ্চয় গেছেন। (সরকারী গেস্ট হয়ে অবশ্যই)।

কাল্পনিক মানচিত্রের কিচেন্দে গ্রামে ঘনাদাকে নিয়ে যাবার জন্য যাত্রা ফন্দি এঁটেছিল তার চেয়েও বেশি আহাম্মুকি করেছি আমি। ঘনাদার অভিযানের রুট ম্যাপ তৈরি করার জন্য পৃথিবীর আউটলাইন মানচিত্র যোগাড় করার চেষ্টাকে, এ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়। ভুলে গেলে ঘনাদা গেছলেন মঙ্গলগ্রহে, এ কথাটা ভুলে যাওয়া অমার্জনীয় অপরাধ বই কি! পৃথিবীর মানচিত্রে মঙ্গলগ্রহও নেই আর সমুদ্রের অতলে যে-সব জায়গায় ডুবুরি হয়ে তল্লাশি চালিয়েছেন তিনি তারও ঠিকানা মিলবে না।

অবশ্য অভিযাত্রী ঘনাদার যে-কোন বিবরণ, সে যত বড় রিসার্চ ওয়ার্কারই লিখুক কোন দিন সম্পূর্ণ করতে পারবে না, এটাই যা সান্ত্বনা।

মশা প্রেমেন্দ্র মিত্র / টীকা ও ব্যাখ্যা ঃ ধরণী ঘোষ

মুখবন্ধ ঃ ঘনাদা কাহিনীর সটীক সংস্করণের প্রেরণা পেয়েছি মার্টিন গার্ডনারের The Annotated Alice ও The Annotated Shark এবং উইলিয়াম এস. বেয়ারিং গোল্ড-এর The Annotated Sherlock Holmes থেকে। বেয়ারিং গোল্ড মনে করেন হোমস একজন রক্ত মাংসের মানুষ যিনি এখনও জীবিত। তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন বন্ধু ওয়াটসন, আর্থার কোনান ডয়াল তাঁর পরিবেশক মাত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের আমি অনুরাগী ভক্ত। তবুও আমার বিশ্বাস ঘনাদা চরিতামৃতের আদি লেখক অন্য কেউ, তিনি শুধুই পরিবেশক। লেখার গৌরব ঘনাদার এক অতি বিনয়ী শিষ্য সুধীরের, যার নাম পাওয়া যায় মাত্র একবারই—"ঘনাদার হিজ-বিজ-বিজ"-এ।

মূল গল্প

গল্পটাই আগে বলব, না, গল্প যাঁর মুখে শোনা, সেই ঘনশ্যাম-দার বর্ণনা দেব, বুঝে উঠতে পারছি না।

গল্পটা কিন্তু ঘনশ্যাম-দা, (1) সংক্ষেপে ঘনাদার সঙ্গে এমন ভাবে জড়ান, যে তাঁর পরিচয় না দিলে গল্পের অর্ধেক রসই যাবে শুকিয়ে। সুতরাং ঘনাদার কথা দিয়েই শুরু করা বোধ হয় উচিত।

ঘনাদার রোগা লম্বা শুকনো হাড়-বার করা এমন এক-রকম চেহারা, যা দেখে বয়স আন্দাজ করা একেবারে অসম্ভব। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন যে কোন বয়সই তাঁর হতে পারে। ঘনাদাকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য একটু হাসেন, বলেন, 'দুনিয়ার টহলদারি করে বেড়াতে বেড়াতে বয়সের হিসেব রাখবার কি আর সময় পেয়েছি! তবে—' বলে ঘনাদা যে গল্পটা শুরু করেন, সেটা কখনো সিপাই মিউটিনির, (2) কখনো বা রুশ-জাপানের প্রথম যুদ্ধের (3) সমসাময়িক। সুতরাং ঘনাদার বয়স আন্দাজ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। শুধু এইটুকুই মেনে নিয়েছি যে গত দু'শ বছর ধরে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যান নি, হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই।

কয়েক বছর হ'ল কেন যে কৃপা করে তিনি আমাদের এই গলিটির ছোট্ট মেসে (4) এসে উঠেছেন তা ঠিক বলতে পারি না। আমাদের ছুটি-ছাটার আড্ডায় তিনি যে নিয়মিতভাবে এসে বসেন, এও তাঁর অসীম করুণা বলতে হবে। প্রায়ই অবশ্য তিনি ভয় দেখান যে পাততাড়ি গুটিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন, কিন্তু সাধারণতঃ সেটা মাসের শেষে, মেসের খরচের তাগাদা পড়বার সময়। বুঝে শুনে কিম্বা হতাশ হয়েই তাঁর কাছে তাগাদা করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। ঘনাদা আমাদের আড্ডায় এসে নিয়মিত-ভাবে ভালো আরাম-কেদারাটায় বসেন, যার ভাগ্য যেদিন

আলোচনা

1। ঘনশ্যাম-দা—ঘনশ্যাম দাসের ঊর্ধ্বতন দ্বাবিংশতম পূর্বপুরুষ ঘনরামকে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস করে রাখে। হাত বদল হতে হতে ভবিষ্যতে মেক্সিকো বিজেতা হের্ণান্দো কর্টেজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় কিউবাতে। তখন ঘনরামের নাম ছিল গানাদো। 1520 খ্রীষ্টাব্দে চাক আবিষ্কার করে তিনি কর্টেজ এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রাণ বাঁচান। কৃতজ্ঞ কর্টেজ ঘনরামকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। ঘনরামের ইচ্ছায়ই তাঁর পদবী দেওয়া হয় দাস। 1533 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, অর্থাৎ চৈতন্য-দেবের তিরোধানের সময়ে ঘনরাম দেশে ফেরেন। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী কয়া, পেরুর নৃপতির এক সূর্যসেবিকা। ঘনশ্যামের ঊর্ধ্বতন ষোড়শতম পূর্ব পুরুষ বচনরাম ছিলেন ঔরংজেবের দরবারে মীর-উ-ইশারৎ (বিশ্রিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট) দাওয়ানি দিগার (আমীর ওমরাহদের না জানিয়ে গোপন খবর সংগ্রহ করে শাহানশাহ-এর কাছে লিখে পাঠানো যার কাজ)। বচনরাম আগ্রার শহর কোতোয়াল সিদ্দি ফুলাদের একমাত্র মেয়ে ফিরোজাকে রাজপুতনার মরুভূমিতে দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। 1866 খ্রীষ্টাব্দের 19শে আগস্ট (1666র 29শে আগস্ট হবে ; "আগ্রা যখন টলমলে" ঘনাদার ভুল)। শিবাজীর আগ্রা থেকে পালিয়ে যাওয়ার নাটকে বচনরাম এবং ফিরোজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ঘনাদার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এক দাদার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে নাম অজ্ঞাত। তিনি ঘনাদাকে ডাকতেন ঘণ্টা বলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ঘনাদা এই দাদার সঙ্গে উত্তর মেরুর কাছে ব্যাফিনস বে-তে ছোট এক বেনামী দ্বীপে ভয়ঙ্কর কলের মাথায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। ঘনাদা এই দাদাটিকে একটি মাত্র প্রশ্ন করেন—গাছ আগে না বীজ

ভাল থাকে, তার কাছে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরান, তারপর চোখ বুজে প্রায় ধ্যানস্থ হ'য়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হয়তো আমাদের কোন একটা কথায় বেশ একটু উচ্চৈঃস্বরেই হেসে ওঠেন।

অপ্রস্তুত হয়ে আমরা তখন তাঁর দিকে তাকাই। ঘনাদা একটু নড়েচড়ে উঠে বসে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলেন, 'কি কথা হচ্ছিল—বন্যার ?'

আমরা লজ্জিত ভাবে স্বীকার করি যে সামান্য দামোদরের বানের (5) কথা আমরা আলোচনা করছিলাম।

ঘনাদা আমাদের দিকে এমন করুণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকান, মনে হয় দামোদরের বানে আমাদের নিজেদের ভেসে যাওয়াই ভালো ছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'টাইড্যাল ওয়েভ (6) কাকে বলে জান ? দেখেছ কখনো সেই প্রলয়ের ঢেউ—যাকে বলে সমুদ্র জলোচ্ছ্বাস !'

সঙ্কুচিতভাবে স্বীকার করি যে নামটা জানলেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিজেদের কোন অভিজ্ঞতা নেই।

ঘনাদা হেসে বললেন,—'কেমন করে আর থাকবে ! তাহলে শোন। তখন মুক্তোর ব্যবসা করব বলে তাহিতি (7) দ্বীপে গিয়ে উঠেছি—'

ঘনাদার সেই সুদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক গল্প থেকে জানা যায় যে কি করে এই রকম এক টাইডাল ওয়েভের মাথায় এক বেলায় তাহিতি থেকে একেবারে ফিজি (8) দ্বীপে গিয়ে তিনি উঠেছিলেন।

এ গল্প শোনার পর আমাদের অবস্থা কি হয়, তা বলাই বাহুল্য। দিন দুপুরে সূর্যের সামনে মিটমিটে লণ্ঠনের মত আর কি !

ঘনাদার ভয়ে আমাদের অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয় ; কিন্তু আটঘাট বেঁধে যতই কিছু বলি না কেন, ঘনাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। দেখা যায়, ঠিক তিনি টেক্কা দিয়ে বসে আছেন !

হয়তো কথায় কথায় কে বলেছে যে, আজকাল অনেকেরই চোখে চশমা – চোখের জোর আর বড় বেশী নেই। ঘনাদা তাঁর মার্কা-মারা হাসিটি হেসে অমনি গিয়ে উঠলেন একেবারে অ্যাণ্ডিজ (9) পাহাড়ের চূড়োয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি 'কণ্ডর' শকুনের (10) বাসার খোঁজে।

'হ্যাঁ, চোখের জোর দেখেছি বটে সেবার ! অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের ওপর পথ হারিয়ে ফেলেছি, শীতে প্রায় জমে যাবার যোগাড়, সঙ্গে একজন আর্জেন্টাইন (11) শিকারী আর 'বোরোরো' জাতের এক সাড়ে ছ-ফুট লম্বা রেড ইণ্ডিয়ান গাইড্। সন্ধ্যা হয় হয়, আর খানিকক্ষণের মধ্যে পথ না খুঁজে পেলে এই পাহাড়ের ওপরই বরফ চাপা

আগে ? সে বোধ হয় এত দিনে ভাবতে ভাবতে শেষ হয়ে গেছে। 1953 খ্রীস্টাব্দের শেষ দু-এক মাস ঘনাদা মেসে ছিলেন না। ফেরার দিনই এই দাদাকে হঠাৎ ঘরে দেখা যায় এবং ঘনাদার পায়ের ধুলো নিয়ে সেই দিনই তিনি চলে যান।

2। সিপাই মিউটিনির—শুরু 1857 খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শেষ 1858 খ্রীষ্টাব্দের জুলাইতে। এটি নিছক সিপাহী বিদ্রোহ না ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম তা নিয়ে বিতর্ক আছে। যাঁরা মনে করেন এটি একটি গণ-অভ্যুত্থান তাঁরা মিউটিনির বদলে 'আপরাইজিং' (Uprising) শব্দটির পক্ষপাতী। রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'—এ (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩) লিখেছেন : (দমদমের দৈনিক নিবাসে 1857 খ্রীষ্টাব্দের) জানুয়ারী মাসের একদিন একজন নীচজাতীয় লস্কর জলপান করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীর নিকট তাহার লোটা চায়, সিপাহী ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠে, এবং আপনাদের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব জানাইয়া, লস্করকে লোটা দিতে অস্বীকার করে। লস্কর বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া কহে, 'উচ্চজাতি ও নীচজাতি, বস্তুতঃ কিছুই নহে, সকলই এক হইয়া যাইবে, যেহেতু টোটা গোরু শূকরের চর্বিতে প্রস্তুত হইতেছে ; এই টোটা সিপাহীদের সকলকেই ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং কোম্পানীর রাজত্বে আর জাতি-বিচার থাকিবে না"। আমার বিশ্বাস এই তেজস্বী লস্কর (দাস-পদবীর লোকদের তখন নীচ-জাতি মনে করা হত) ঘনাদারই পূর্বপুরুষ।

3। রুশ-জাপানের প্রথম যুদ্ধের—1904 খ্রীস্টাব্দের 8ই—9ই ফেব্রুয়ারীর রাতে জাপান পোর্ট আর্থার আক্রমণ করে দু'টি রুশ যুদ্ধ জাহাজ অকেজো করে দেয়। পরে কোরীয় প্রণালীর উত্তরে রুশ ভ্লাডিভোস্টক নৌবহরটিও ধ্বংস করে। মে মাসে রুশ সৈন্যদল ইয়ালু নদীতে হেরে যায় এবং অগাস্টে জেনারেল কুরোপাটকিন (সুকুমার রায় "লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকের একটি গানে এঁর কথা বলেছেন) মুকডেনের দিকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হন। সাত মাস অবরোধের পর 1905 খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে জাপান পোর্ট আর্থার নিয়ে নেয়। অক্টোবর মাসে অ্যাডমিরাল রোজ্‌দেস্ত্‌ভেনস্কির (এর কথাও "লক্ষ্মণের শক্তিশেল"-এর ঐ গানটিতে আছে) নেতৃত্বে একটি রুশ নৌবহর রওনা হয়েছিল বাল্টিক সাগর থেকে। কিন্তু 27শে মে অ্যাডমিরাল টোগো কোরীয় প্রণালীতে অবস্থিত তুসুশিমার কাছে এটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

1904 খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে রুশ অ্যাডমিরাল

পড়ে মরতে হবে। এমন সময় আমাদের চূড়ার নিচেকার খানিকটা মেঘ একটু ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু বারো হাজার ফুট ওপর থেকে সেই ফাঁক দিয়ে কি আর দেখা যাবে! কিন্তু তখনো 'বোরোরো' জাতের তীক্ষ্ম দৃষ্টির কথা তো জানি না। হাত দুটো দূরবীনের মত করে সে একবার চোখের সামনে ধরলে, তারপর বললে, 'ব্যস্, আর ভয় নেই!'

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয় ত নেই, কিন্তু কি দেখতে পেলে তুমি?'

সে হেসে বললে, কেন, ওইত নিচে শিকারীদের তাঁবু ফেলা রয়েছে, বড় একটা কুকুর নিয়ে লাল কোট-পরা এক শিকারী এইমাত্র তাঁবুতে ঢুকল'—শুনে আমি ত অবাক্।

ঘনাদার কথা শুনে আমরা ততোধিক অবাক্ হয়ে বললাম,—'বারো হাজার ফুট ওপর থেকে লাল রঙের কোট পর্যন্ত দেখতে পেলে!'

'তা না হলে আর চোখের জোর কিসের! শকুনের চোখ কি রকম জানো? দু' মাইল ওপর থেকে ভাগাড়ের গরুর লাশ ওরা দেখতে পায়। এই বোরোরো শিকারীদের চোখ তেমনি।'

এরপর আমরা যে নির্বাক্ হয়ে গেলাম তা বলাই বাহুল্য।

প্রায় নির্বাক হয়েই আজকাল থাকি। এর ভেতর সেদিন কি থেকে বৃষ্টি মশার (12) প্রসঙ্গ উঠে পড়েছিল। ঘনাদা তখনও এসে পৌঁছান নি। তাই বোধ হয় আমাদের অতটা সাহস। তাছাড়া ভেবেছিলাম যে সামান্য মশা মারবার ব্যাপারে ঘনাদা তাঁর কামান দাগা প্রয়োজন বোধ করবে না।

কিন্তু ভুল ভাঙতে আমাদের দেরি হোল না। বিপিন সবে তাদের গাঁয়ে কি ভাবে মশা মারবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেই কথা তুলেছে, হঠাৎ দরজায় ঘনাদার আবির্ভাব!

'কি কথা হচ্ছিল হে?'

আমরা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বলি,—'নাঃ, এমন কিছু নয়, এই মশা মারবার কথা বলছিলাম।'

বিপিন তাড়াতাড়ি আরাম-কেদারাটা ছেড়ে সসম্মানে ঘনাদার জন্যে জায়গা করে দেয়।

ঘনাদা তাতে সমাসীন হয়ে শিশিরের কাছে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বললেন, 'ওঃ, মশা!'

আমরা কতকটা আশ্বস্ত হই। যাক ঘনাদার দৃষ্টি তাহলে মশা পর্যন্ত পৌঁছবে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই বোমা ফাটল—যে সে বোমা নয়, একেবারে 'অ্যাটমিক'!

'হ্যাঁ, মেরেছিলাম একবার একটা মশা।'

বিষয়ের মন্ত্রী প্লেহ্ভে (Plehve) বোমা বিস্ফোরণে মারা যান। ডিসেম্বরে এবং 1905 খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হরতাল হয়। 22শে জানুয়ারী রবিবারে একজন ধর্মযাজকের নেতৃত্বে একটি মিছিল সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের (বর্তমান লেনিনগ্রাড) বিখ্যাত শীত প্রাসাদে জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে একটি আবেদনপত্র দিতে যায়। তাদের উপর গুলি চলে, মারা যায় প্রায় এক হাজার নিরস্ত্র মানুষ। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যায়। জারের কাকা এবং মস্কোর গভর্নর, গ্রান্ড ডিউক সের্গেইকে একটি বোমা টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দেয়। অবশেষে 1905 খ্রীস্টাব্দের জুনে পোটেমকিন যুদ্ধ জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকেরা অফিসারদের হত্যা করে। এ সবই রুশ-জাপান যুদ্ধের ফল।

ঐ জুনেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চান। 5ই সেপ্টেম্বর নিউ হ্যাম্পশায়ারের পোর্টসমাথ-এ স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া জাপানকে পোর্ট আর্থার ছেড়ে দেয়। জাপান আরও পায় সাখালীন দ্বীপের দক্ষিণভাগ এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরীয় রেলপথ। কোরীয়াকে বলা হয় তার আশ্রিত রাজ্য (Protectorate)। উনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রথম ইউরোপ এশিয়ার কাছে হার মানে।

4। গলিটির ছোট্ট মেসে—এই 'আঁকাবাঁকা' গলিটির নাম বনমালী নস্কর লেন এবং এটি দক্ষিণ কলকাতার সেই 'বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়, "করুণ আত্মছলনায় যাকে আমরা হ্রদ বলে অভিহিত করে থাকি' তার খুব কাছে। সুধীর অবশ্যই গলিটির আসল নাম লেখেনি। বেহালায় একটি বনমালী নস্কর রোড আছে তবে ঘনাদা নিশ্চয়ই সেখান থেকে রবীন্দ্র সরোবরের সান্ধ্য অধিবেশনে হেঁটে আসতে পারেন না। বাড়ীর নম্বর নিয়েও সংশয় আছে। 'টিল' কাহিনীতে বলা হয়েছে বারো আর 'শিশি' বা পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চারে বাহাত্তর। 'তেতলায় একটি চোর-কুঠরি গোছের ঘরে ঘনাদা একা থাকেন।' সামনের ছোট একটু খোলা ছাদে একটি 'roof garden' করে বিশ্বের খাদ্য সমস্যা মেটানোর একবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ঘরের দেওয়ালে মেঝের কাছে একটি কোণে একটা পেনসিল গলাবার মত ছোট একটা ফুটো দেখা দিয়েছিল। সেই সূত্রেই আমরা ঘনাদার প্রথম মঙ্গলগ্রহ অভিযানের কথা জানতে পারি। সদাশিব বাড়িওয়ালাকে চটাবার বা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলার আসামী হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও সুধীর ও তার বন্ধুরা দক্ষিণের দেওয়ালে একটা

আমরা স্তম্ভিত ! ঘনাদা মশার প্রসঙ্গও বাদ দিতে চান না দেখে নয়, স্তম্ভিত, তাঁর এই অবিশ্বাস্য বিনয়ে। মশা-ই যদি মারতে হয়, তাহলে ঘনাদা মাত্র একটি মশা মারবেন, এ যে কল্পনাও করা যায় না !

শিশির সাহস করে বলেই ফেলল—'একটি মশা মেরেছিলেন !'

'হ্যাঁ, একটিমাত্র মশা-ই জীবনে মেরেছি।' আমাদের হতবুদ্ধি করেই ঘনাদা বলে চললেন—'মেরেছি 1939 (13) সালের 5ই আগস্ট, সাখালীন (14) দ্বীপে!'

আমরা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'সাখালীন দ্বীপের নাম শুনেছ, কিন্তু কিছুই জানো না—কেমন? দ্বীপটা জাপানের উত্তরে সরু একটা করাতের মত উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ দিকটা ছিল জাপানীদের, আর উত্তরটা রাশিয়ার। সেই দ্বীপের পূব-দিকের সমুদ্রকূলে তখন অ্যাম্বার (15) সংগ্রহ করবার একটি কোম্পানির হয়ে কাজ করছি। এমন অখাদ্য পাণ্ডববর্জিত জায়গা দুনিয়ায় আর আছে কি না সন্দেহ। বছরের অর্ধেক সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, আর বাকি অর্ধেক বরফে সব জমে যায়। তার ওপর আছে ভীষণ তুষার-ঝড় আর গাঢ় জমাট কুয়াশা। কোন রকমে দামী কিছু অ্যাম্বার সংগ্রহ করেই সেমুখো আর হব না এই ছিল মতলব, কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। আমাদের কোম্পানির তানুলিন নামে এক চীনা মজুর একদিন সকালে হঠাৎ নিরুদ্দেশ; তার সঙ্গে এ পর্যন্ত যা অ্যাম্বার যোগাড় হয়েছিল, সেই মহামূল্য থলিটাও।

সাখালীন দ্বীপটি ত নেহাত ছোটখাট নয়, তার বেশির ভাগ আবার জঙ্গল আর পাহাড়। সে সব পাহাড়-জঙ্গলের অনেক জায়গায় মানুষের পায়ের চিহ্নই পড়েনি। সুতরাং এই দ্বীপে কাউকে খুঁজে বার করা সোজা নয়। তবে একটা আশার কথা ছিল এই যে, অ্যাম্বারের মত দামী রত্ন চুরি করে সাখালীন দ্বীপে লুকিয়ে থেকে কারুর লাভ নেই। সেই চোরাই মাল বেচতে তাকে কোন বড় সভ্য দেশে যেতেই হবে। আর সাখালীন দ্বীপ ছেড়ে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কাউকে যেতে হলে প্রধান শহর অ্যালেকজ্যানড্রোভস্ক (16) থেকে ভ্লাডিভস্টকের (17) স্টীমার না ধরে উপায় নেই। অক্টোবরের পরে অবশ্য সমুদ্র জমে বরফ হয়ে যায়। তখন লুকিয়ে কুকুর-টানা স্লেজে করে পালান সম্ভব। কিন্তু তার আগে প্রধান স্টীমার-ঘাটায় কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করলে চোর কিছুতেই সাখালীন থেকে বেরুতে পারবে না। অক্টোবর

জানালা কোটাতে রাজী হয়েছে। 'মশা' আর 'পোকা'র সঙ্গে প্রকাশিত অজিত গুপ্তের আঁকা ছবি থেকে জানা যায় ঘনাদার ঘরে আছে একটি হাঁড়ি, দুটি তোরঙ্গ, একটি টুল, একটি চেয়ার, একটি তক্তপোশ (যার তলায় তিনি একবার লুকিয়ে ছিলেন; 'কাচ' দ্রষ্টব্য), একজোড়া বিদ্যাসাগরী চটি, শেল্ফ, আলনা, হুঁকোর কলকে, মাথার চিরুনি, নখের নরুণ, সেলাই-এর ছুঁচ আর কান খুশকি কাঠি (ঘনাদা কানে দিয়েই বুঝতে পারেন ঢেউ কম না বেশি)। এছাড়া আছে টাইওয়ানের হাতুড়ে ডাক্তার চিংহুন-এর তৈরি চশমা, প্রেসবাইওপিয়া (চালশে) আর ডাইক্রোম্যাটিক-ভিশন-এর (রং কানা) নিদান। ঘনাদার বাঁধানো দাঁতের কৌলতে কোবাল্ট বোমার গোপন অঙ্ক শত্রুপক্ষের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। আর সাউথ জর্জিয়াতে কেনা একটি ছুরি না থাকলে তিনি দক্ষিণ মেরুর গরমে গলে পচে মরতেন।

শিল্পী প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ঘনাদা

অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে গৌরের সংগ্রহ করা দুর্লভ 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' তেল ঘনাদা মাথায় শুধু মেখে নয়, পুরো তেলের শিশিটাই উল্টে ভেঙে দিয়ে সব তেল নষ্ট করেছেন। যদিও গৌর, শিবু, সুধীর ও শিশিরের কাছে তাঁর বক্তব্য: "ও তেল নষ্ট হয়ে ভালই হয়েছে। ওটা মাথায় মাখার তেলই নয়।"

দেবসাহিত্য কুটির প্রকাশিত, বেণুবীণা-1374 বঙ্গাব্দ

মেসের আড্ডাঘর দোতলায়। 'মাছি' সংলগ্ন অজিত গুপ্তের ছবি অনুসারে এখানে আছে ঘনাদার মৌরসী-পাট্টা আরাম কেদারা, একটি টাইমপিস ও কিছু বই। অন্ত

পর্যন্ত তাকে খুঁজে বার করবার সময় অন্ততঃ আমরা পাব।

বেতারে অ্যালেকজ্যানড্রোভস্ক-এর পুলিসের কাছে সমস্ত খবর পাঠিয়ে আমি ও আমাদের ক্যাম্পের ডাক্তার মিঃ মার্টিন দুজন কুলি নিয়ে তানলিনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

কয়েকদিন জলা-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, তখন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটা হদিশ পেয়ে গেলাম।

টিম্নারা (18) পাহাড়ের কাছে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা তাঁবু ফেলেছি। ওখানকার আদিম গিলিয়াক জাতির এক শিকারীর কাছে সকাল বেলায় একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে, এই দিক দিয়ে একজন চীনাকে যেতে দেখা গেছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে খবরে বিশ্বাস করবার মত কোন প্রমাণ পাই নি।

রাত্রে তাঁবুর মধ্যে ঘুমোন একরকম অসম্ভব। সাখালীন দ্বীপে বড় হিংস্র জানোয়ার বলতে শুধু ভালুক ছাড়া আর কিছু নেই। সাধারণতঃ তারা মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু দিনে মাছি ও রাত্রে মশা যা আছে, তা হিংস্র জানোয়ারকে হার মানায়। আমি আর মিঃ মার্টিন তাই কোন রকমে ঘুমোতে না পেরে তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, 'দেখেছেন মিঃ মার্টিন!'

মিঃ মার্টিনের দৃষ্টিও সেদিকে তখন গেছে। অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! বেশ জোরালো আলো বলে মনে হচ্ছে। এই জনমানবহীন জায়গায় ওরকম আলো আসছে কোথা থেকে? ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি!'

খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে বললাম, 'না, ভুতুড়ে নয়, বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। দূরের ওই পাহাড়ে ঢিবিটার পেছনে নিশ্চয় কোন একটা বাড়ি আছে—এ আলো সেখান থেকেই আসছে।'

মিঃ মার্টিন অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু এখানে শখ করে অমন বাড়ি করবে কে? গিলিয়াক, ওরোক বা টুঙ্গুস জাতের অসভ্য শিকারী ছাড়া এ অঞ্চলে ত কেউ আসে না। এদিকে কোন খনি ইদানীং হয়েছে বলেও জানি না।'

ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌতূহল যত বেশীই হোক, সন্ধান নেবার জন্যে সকাল পর্যন্ত আমরা নিশ্চয় অপেক্ষা করতাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে রাত্রির স্তব্ধতা হঠাৎ এক অমানুষিক চীৎকারে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

একবার আমি ও মিঃ মার্টিন দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলাম, তারপর ভেতর থেকে টর্চটা বের করে এনে কোন কথা না বলেই বেরিয়ে পড়লাম। একেবারে নিরস্ত্র

আসবাবপত্রের হদিশ পাওয়া যায়নি, যেমন যায়নি অন্য বাসিন্দাদের ঘরের বিবরণ। সব মিলিয়ে কটি ঘর আছে বলা শক্ত। প্রতিটি ঘরে কজন করে থাকেন তাও অজ্ঞাত। তবে বাসিন্দাদের সংখ্যা সাতের কম নয়। সাত নম্বর সীটের প্রথম বোর্ডার বাপি দত্ত হাঁসের পেটে ভারী জলের ম্যাপ গুঁজত। সে ছেড়ে যাওয়ার পর আসে সুধীর চাকী, যার ছাতা ঘনাদা আরেক জনকে দান করতে বাধ্য হন। অন্যদের মধ্যে সুধীর ছাড়া নাম পাওয়া যায়, শিবু, শিশির আর গৌরের দেবু থাকে। 'মাছি'তে মিশরী মৌলবী সাজানো হয়েছিল, বোধ হয় মেসে থাকে না। মেসের ঠাকুর রামভুজ আর ফাই ফরমাস খাটে বনোয়ারী। এদের কল্যাণে শনিবার রাত্রে এবং রবিবার দুপুরে ('মাছ' দ্রষ্টব্য) খাওয়ান ভালই হয়। বাসন মাজে ঝি লছমনিয়া।

5. **দামোদরের বান**—1948 খ্রীস্টাব্দে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে নদীতে আর বন্যা হয় না। তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেত-এ এখন বাঁধ আর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়েছে। দুর্গাপুরে একটি ব্যারেজ আর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। বোকারো এবং চন্দ্রপুরাতেও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়েছে।

6. **টাইড্যাল ওয়েভ**—প্রধান কারণ দু'টি—ঝড় এবং ভূমিকম্প। 1787 খ্রীস্টাব্দে পূর্ব ভারতে একটি ঝড়ের পর সমুদ্রের জল 20 মাইল ভেতরে চলে এসেছিল, মৃত্যু হয়েছিল 10,000 লোকের। এরপর থেকে বিভিন্নবর্ষ সমুদ্রজলোচ্ছ্বাসের বছর, স্থান এবং মৃতের সংখ্যা সমেত একটি তালিকা দেওয়া হল : 1896—সানরিকু (জাপান)—22,000 ; 1900—গ্যালভেস্টন (টেক্সাস)—6,000 ; 1915—গ্যালভেস্টন—300 ; 1946—হাওয়াই—173 ; 1960—আগাদির (মরোক্কো)—12,000 ; 1960—পূর্ব পাকিস্তান—10,000 ; 1978—আকাযুটলা (এল সালভাদোর)—100। ঘনাদার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে এক টাইড্যাল ওয়েভ দেখা দিয়েছিল '1937 সালের 17ই সেপ্টেম্বর' ('ঘড়ি' দ্রষ্টব্য)।

7. **তাহিতি দ্বীপে**—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ার প্রধানতম দ্বীপ। রাজধানী পাপীতে, লোকসংখ্যা 1983-র হিসেবে 15,220। তাহিতির উর্বর উপত্যকায় প্রচুর কলা, আপেল, কমলালেবু আর নারিকেল জন্মায়। এছাড়া কফি, কাকাও (যার থেকে কোকো হয়), আখ এবং তুলোর চাষ হয়। অধিবাসীরা মূলতঃ ধর্মান্তরিত খৃষ্টান। দ্বীপটির আয়তন 600 বর্গ মাইল।

বিজ্ঞানী ঘনাদা ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

ঘ-না-দা !

ছোটদের কাছে একটা দারুণ নাম—যাঁর চলনে বলনে ছড়িয়ে আছে মজা—মজা—আর মজা ! শুধু ছোটরা কেন, আমরা, বড়রাও কি তার রস থেকে বঞ্চিত ? নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু শুধুই কি মজা ? না, ভালো করে পড়লে দেখা যাবে ঐ বিচিত্র চরিত্রটির মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিস ছড়িয়ে আছে যা পড়ার পর মজা হয়তো ঠিকই পাওয়া যায় কিন্তু সেই সঙ্গে মনকেও বেশ একটু ভাবিয়ে তোলে।

72 নম্বর বনমালী নস্কর লেনের অর্থাৎ সেই সরু গলির মধ্যেকার মেস বাড়িটার ঠিকানাটাও আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে—যেখানে ওপরের টঙের ঘরে ঘনাদা আস্তানা গেড়েছেন আর আসর জমিয়ে তুলেছেন দোতলার আড্ডার ঘরে। এমনও শোনা গেছে, কোনও কোনও উৎসাহী পাঠক নাকি উত্তর কলকাতার ঐ রাস্তাটি খুঁজে খুঁজে হয়রানও হয়েছে—72 নম্বরের বাড়ি খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু পাবে কি করে ? ঐ বনমালী নস্কর লেন নামটার অস্তিত্ব যে শুধু লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের মাথার ভিতর তা তো তারা জানে না !

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক স্যার আর্থার কনান ডয়েলের গল্পের অপূর্ব চরিত্র শার্লক হোমসের বাড়ি নিয়েও নাকি অনেকবার ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটেছে। লণ্ডনের বেকার স্ট্রীটের 21 নং বাড়িটা ছিল গল্পের শার্লক হোমসের ঠিকানা। গল্প পড়ে মনেও হ'ত না যে শার্লক হোমস্ একটি কাল্পনিক চরিত্র এবং তাঁর ঠিকানাটাও কাল্পনিক। তবু গল্প পড়ে কেউ কেউ হন্যে হয়ে ছুটত ঐ ঠিকানার খোঁজে—যদি শার্লক হোমস্‌কে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পাওয়া যায়।

রচনার মধ্যে কতখানি মুন্সীয়ানা থাকলে তবেই এরকম ব্যাপার সম্ভব হতে পারে ভাবলে অবাক্ লাগে। ঠিক এই রকম অসম্ভব মুন্সীয়ানার পরিচয় আমরা পেয়েছি প্রেমেন্দ্র মিত্রের "ঘনাদা" চরিত্রের কল্পনার মধ্যে।

হ্যাঁ, ঘনাদা সত্যিই একটি বিচিত্র চরিত্র। এখানে একটা "অসাধু" ভাষা ব্যবহার করতে ইচ্ছে হচ্ছে। অসাধু হলেও কথাটা বড়ই অর্থবহ। কী কথা ? বলেই ফেলি তা হলে। "গুল মারা"। এই ঘনাদা গুল মারতে দারুণ ওস্তাদ্। এমন সহজ ভাবে এমন অসম্ভব অসম্ভব গল্প তিনি বলে যান যা আদপেই যে সত্যি নয়,—সমস্তটাই তথাকথিত 'গুল',—একথা শ্রোতারাও বোঝে এবং তা সত্বেও তাঁকে ছাড়তে চায় না। ঘনাদা খেতে ভালোবাসেন তাই তাঁর জন্য মেসের বাসিন্দারাই যোগাড় করে আনে নানা রসনা-মুখরোচক সুখাদ্য, আর দামী দামী সিগারেটও। আর তারই আড়ালে বসে চলে ঘনাদার রাজা-উজীর-মারা গল্প। সত্যি না হলেও সে গল্পের রস এতই চিত্তাকর্ষক যে সেজন্য কেউ কিছু মনে করে না, ঘনাদাকে পারতপক্ষে চটাবার চেষ্টাও করে না কেউ—বিশেষ করে মেসের বাসিন্দা শিশির, শিবু, গৌর আর স্বয়ং 'আমি' তো বটেই।

পুরো নাম ঘনশ্যাম দাস। কিন্তু সে নাম কেউ ব্যবহার করে না, ঘনাদা নামটাই চালু হয়ে গেছে। রোগা, লম্বা, শুকনো হাড়-বার-করা চেহারা। বয়স ? তা 35ও হতে পারে 55ও হতে পারে। অবশ্য দিনে দিনে প্রকৃতির নিয়মে নিশ্চয়ই বেড়ে চলেছে, কিন্তু ঘনাদার ওপর তার কোনও ছাপ পড়েছে বলে মনে হয় না।

এই ঘনাদার কথাবার্তা শুনলে মনে হবে, এবং আমরাও তা মেনে নিয়েছি, যে গত 200 বছর ধরে পৃথিবীতে হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যান নি, হেন বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোন-না-কোন রকম ভাবে যোগ নেই। ভূগোলকে তো তিনি প্রায় গুলে খেয়েছেন।

ভূগোলকে যদি আমরা বিজ্ঞানের একটা বিভাগ বলে ধরি তা হলে এদিক দিয়েও হয়তো ঘনাদা একজন মস্ত বড় বিজ্ঞানী।

আফ্রিকার সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল, যেখানে দিনের বেলাও এক ফোঁটা সূর্যের আলো ঢুকবার সাহস পায় না, নদী-জলা সব কুমীর আর হিপোপটেমাস দিয়ে ঠাসা, ঘাসবনের ভিতর দিয়ে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দলে দলে সিংহ আর সিংহী ঘুরে বেড়াচ্ছে, বনস্পতির আড়াল দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে চলেছে হাতির পাল, গোঁয়ারগোবিন্দ গণ্ডার আর বুনো মোষ ছুটে চলেছে তীরবেগে, হরিণ, জেব্রা, জিরাফ ভয়ে দৌড়চ্ছে—সর্বত্রই ঘনাদার অবাধ গতি। পড়েছেন বুনো জংলী মানুষদের খপ্পরে, আবার নিজেও হানা দিয়েছেন কিছু উপত্যকার পাহাড়ী গরিলার ডেরায়। শিকারে তাঁর জুড়ি নেই, যখন বন্দুক ধরেন তখন অব্যর্থ হাতের নিশানা। তার ওপর আছে তাঁর যুযুৎসু বা ক্যারাটের প্যাঁচ—অতি বড় পালোয়ানও যার খপ্পরে একবার পড়লে আর নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না।

শুধু কি জঙ্গলে? জলের ওপরে, সমুদ্রের তলায়, অস্ট্রেলিয়ার মরুপ্রান্তরে, আল্পস্-এর তুষার ধবল চূড়ায় —মায় উত্তর আর দক্ষিণ-মেরুর কনকনে শীতে কত দিন কত রাত কাটিয়েছেন তিনি! হ্যাঁ, এই আমাদের ঘনাদা।

বিজ্ঞানকে নিয়েও ঘনাদা কম মোচড় দেন নি। তা হলে কি তিনি একজন বিজ্ঞানী? তা—তা,—হ্যাঁ বিজ্ঞানীও বটেন বৈকি! নিজের হাতে বিজ্ঞানের গবেষণা না করলেও নানা বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে এসে তিনি যে সব তথ্য পরিবেশন করেন তা কিন্তু সত্যি অস্বাভাবিক মনে হলেও মোটামুটি বিজ্ঞান-নির্ভর—বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র বা নিয়মকে মেনে নিয়েই তা রচিত। আর খুঁটি-নাটি সেই তথ্যগুলি এত নিখুঁত যে মনেই হয় না এ কোনও বিজ্ঞানীর নিজস্ব গবেষণালব্ধ ফল নয়। এ ব্যাপারে ঘনাদাকে অনন্য বলা যেতে পারে এবং এ জন্যই তাঁর "গুল-দেওয়া-কাহিনী-গুলোর" মধ্যেও কেমন একটা অনাস্বাদিত আনন্দ পাওয়া যায়। পড়ে ভাবতে হয় এবং ভেবে মনে হয়, আচ্ছা, এ-রকমটা তো সত্যিই অসম্ভব নয়! হতে পারে না কি? আবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহ জাগে বাস্তবে কখনও এ জিনিস ঘটতে পারে?

ঘনাদার গল্প এক-একটা এক এক স্বাদের—যদিও ঘনাদার চাল মারার পরিচয় বহন করে আছে সব ক'টিই। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র এমনভাবে চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন যে তার প্রত্যেকটা চালচলনে যেমন মজা লাগে তেমনি মাঝে মাঝে ভাবায়ও। লেখকের নিজের ভিতর যে একটা বিজ্ঞান-মানসিকতা আছে সেটাই এ সব গল্পে ধরা পড়ে এবং লেখকের প্রতি অলক্ষ্যে একটা শ্রদ্ধাও জেগে ওঠে আমাদের মনে। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম জীবনে বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও নিজে বিজ্ঞানী ন'ন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর কৌতূহল অদম্য আর তারই ছায়া এসে পড়েছে এইসব গল্পে।

ঘনাদা নিজেও, আগেই বলেছি, ঠিক যে অর্থে আমরা বিজ্ঞানী বলি সে অর্থে বিজ্ঞানী ন'ন। কিন্তু তাঁরও একটা বিজ্ঞান মানসিকতা আছে যা ছড়িয়ে আছে তাঁকে নিয়ে লেখা অজস্র গল্পের মধ্যে।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে হয়তো ব্যাপারটা আর একটু স্পষ্ট হবে।

মশার লালাকে রাসায়নিক পরিবর্তন করে সাপের বিষের মত ভয়ঙ্কর করা যায় কি? এ ধরনের কিছু কিছু পরিবর্তন এ যুগের বায়োকেমিস্টরা করবার চেষ্টা করেছেন এবং সে চেষ্টা সাফল্যের দিকেই এগিয়ে চলেছে। ঘনাদার গল্পে দেখেছি জাপানী বিজ্ঞানী নিশিমারাও এ রকম একটা চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন—যদিও উদ্দেশ্য ছিল তাঁর অত্যন্ত অসৎ এবং পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক তো বটেই। ঘনাদা তাঁর বিজ্ঞানমানসিকতার সাহায্যে ঐ উদ্দেশ্য ধরে ফেলেন, তারপর ঐ মশা দিয়েই নিশিমারারও ভবলীলা শেষ করে দেন। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

ইহুদী কীটতত্ত্ববিদ্ জ্যাকবের কাহিনীও এইরকম আর একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও ঐ সময়ে নাৎসী জার্মান্ অর্থাৎ প্রাশিয়ানরা ইহুদীদের ওপর যে জঘন্য অত্যাচার করে চলেছিল তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি ঠিক করলেন সি. সি বা সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া নামে পঙ্গপাল জাতীয় একটি পতঙ্গের সাহায্যে ধ্বংস করে দেবেন সারা ইয়োরোপের শস্যভাণ্ডার। একমাত্র আফ্রিকাতেই এক বিশেষ অঞ্চলে এই জাতের পতঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। জ্যাকব সেইখানে গিয়ে এই পতঙ্গের বংশ বৃদ্ধি করিয়ে তাদের সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়াবার জন্য তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করলেন। কীটতত্ত্ববিদদের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা নতুন নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যে পঙ্গপালের সৃষ্টি হ'ল তা অভূতপূর্ব। জ্যাকব মতলব করেছিলেন তিনি ইটালি থেকে তাঁর এই পঙ্গপালের আক্রমণ শুরু করবেন। কথাটা তিনি তাঁর ভাই আইজ্যাককে বললেন। আইজ্যাক ইহুদী হলেও প্রাশিয়ান সেজে নাৎসীদের আস্থাভাজন হয়েছিলেন—নাম নিয়েছিলেন ভরনড্। দু'জনে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল ট্রেনে। জ্যাকব চাইলেন ভরনড্ ওরফে আইজ্যাক ইহুদী নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণে তাঁর সঙ্গী হোন। আইজ্যাক তখনকার মত রাজী হলেও শেষ পর্যন্ত ঐ নিদারুণ বিপর্যয়ে সারা ইয়োরোপকে জড়াতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি উল্টে ঐ পঙ্গপাল ধ্বংস করার জন্য গোপনে আবিষ্কার করলেন

একরকম রোগবীজাণু যা একটি পঙ্গপালের দেহে কোন রকমে বিঁধিয়ে দিতে পারলে সে নিজে তো রোগাক্রান্ত হবেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পঙ্গপালের দলে ছড়িয়ে পড়বে সে রোগ মহামারী আকারে। নিজেকে গোপন রেখে তিনি একাজে তাঁর প্রতিনিধি ঠিক করলেন ঘনাদাকে এবং ঘনাদা কি কৌশলে একটি মাত্র পঙ্গপালকে ধরে তার ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করে গোটা ইয়োরোপকে শস্যহীন, দুর্ভিক্ষপীড়িত হবার বিপদ থেকে মুক্ত করলেন সে আর এক কাহিনী। নিজে আবিষ্কার না করলেও তার প্রয়োগ কৌশলে ঘনাদার কৃতিত্ব এই গল্পের একটা বড় উপাদান।

এমনি ধারা ভয়ঙ্কর এক আগাছার চাষ করে জমির সমস্ত ফসলকে বিষিয়ে দিয়ে দেশকে দেশ শস্যহীন মরুভূমি করে দেওয়ার প্রচেষ্টা—তারও গল্প শুনেতে পাই ঘনাদার কাছেই।

চাষীর ক্ষেতে আগাছার উপদ্রব এখন প্রায় নির্মূল করা সম্ভব হলেও অনেকেই জানে না যে এমন অনেক আগাছা আছে যাদের বীজ মাটির তলায় 30/40 বছর ঘুমিয়ে থাকতে পারে, তার পর একদিন আলোয় বেরিয়ে এসে তারা শুরু করে দেয় তাদের ধ্বংসক্রিয়া। এমনি ধরনের কয়েকটা আগাছার চলতিনাম 'ব্ল্যাক্ মাস্টার্ড', 'ইভনিং প্রিমরোজ।' এইরকম আগাছার সাহায্যে সারা দেশের কৃষিব্যবস্থা বানচাল করার চেষ্টাকে কি করে ঘনাদা প্রতিহত করলেন সে গল্পও শুনতে মন্দ নয়। আর এর যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

এমনি আরও কত গল্প!

সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। আসলে সেটা একটা নিবন্ত আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টির জল জমে জমে সেই পাহাড়ের ওপর তৈরি হয়ে গেছে এক বিশাল হ্রদ। হ্রদের নিচে যে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি রয়ে গেছে তা কেউ জানে না। কিন্তু ঐ জলের মধ্যে যে হীরে ছড়ানো আছে সে খবর রাখত ঘনাদার ফরাসী বন্ধু পেত্রা। ঐ পেত্রার সঙ্গে ডুবুরীর পোশাক পরে জলে নামলেন ঘনাদা. তার পর একটা হীরে, যাকে দেখে ছোট একটা নীলচে কিন্তু জ্বলজ্বলে নুড়ি বললেও ভুল হয় না, শাবল দিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করে নিয়ে তুলে ফেললেন। দেখা গেল ওর তলায় একটা নলের মত গর্ত রয়েছে আর নুড়ি তুলতেই তাই দিয়ে হুড় হুড় করে জল নেমে যাচ্ছে পাতালের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পেত্রা পাগলের মত ঘনাদার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে এল হ্রদের এক কোণে, তারপর তরতর্ করে দড়ি বেঁধে নেমে গেল নীচে সমুদ্রের বুকে যেখানে একটা মোটর বোট আগেই লুকিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। বোটে উঠেই জোরে ছুটিয়ে দিল সেটা। আর, খানিক পরেই শুরু হল প্রলয় কাণ্ড। হাজার বজ্রের মত শব্দ করে গোটা পাহাড়টাই ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক। আপাতদৃষ্টিতে আজগুবি মনে হলেও তত্ত্বের দিক্ দিয়ে ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বন্ধ হয়ে গেলেও অনেক গভীরে তার আগুন নাও নিবতে পারে—ধিকি ধিকি করে জ্বলছে তো জ্বলছেই। এখন, জ্বালামুখ বন্ধ হয়ে গেলেও একটা ছোট্ট গর্ত রয়ে গিয়েছিল তার গায়ে আর সেই গর্তের ওপর হীরেটা খুব চেপে বসে থাকায় সে গর্ত বন্ধ হয়েই ছিল। হীরের নুড়িটা খুবলে তুলে নিতেই সেই ছোট্ট গর্তের মুখটা গেল খুলে আর সেই গর্তের ভিতর দিয়ে ওপরকার জল তোড়ে গিয়ে পড়তে লাগল একেবারে তলাকার আধ-ঘুমন্ত আগুনে পাহাড়ের সেইখানটায় যেখানে ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল আগুন—যার প্রচণ্ড উত্তাপের কথা ভাবা যায় না। ফলে ঢোকানো জল সেই প্রচণ্ড তাপে সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়ে আবার ঠেলে উঠতে লাগল ওপরে—সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করল প্রচণ্ড চাপের। বাষ্প ক্রমাগত তৈরি হচ্ছে তো হচ্ছেই, তার চাপও ক্রমাগত বেড়ে চলছে তো চলছেই। আর ওপরে তো বেরিয়ে যাবার পথ ঐ সবেধন একটি গর্ত! সেখান দিয়ে আর কতটা বাষ্প বেরিয়ে যেতে পারে? তার আশ-পাশে রয়েছে শিলাখণ্ড, কিন্তু তার সাধ্য ছিল না সে চাপ সহ্য করার। ফলে গোটা পাহাড়টাই ফেটে চৌচির করে দিল সেই প্রচণ্ড বাষ্পের চাপ। তার জন্য শব্দ তো হবেই।

গল্পের খাতিরে ব্যাপারটা হয়তো একটু ফাঁপিয়েই লেখা হয়ে থাকবে কিন্তু বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে দেখলে ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। ভিতরকার রহস্যটা অবশ্য ঘনাদা নিজে উদ্ধার করেন নি, কিন্তু পেত্রার ব্যাখ্যা তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে কি ঘনাদা কখনও বিজ্ঞানীর ভূমিকা নেন নি? হ্যাঁ, তাও নিয়েছেন।

ইউরেনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় মৌল এবং এটি পাওয়া যায় পিচব্লেণ্ড নামক মিনারেল বা খনিজ থেকে। মাদাম কুরি তাঁর প্রথম তেজস্ক্রিয় মৌল ইউরেনিয়াম, তার পর পোলোনিয়াম এবং শেষে রেডিয়ামও আবিষ্কার করেছিলেন এই পিচ্ ব্লেণ্ডেরই পরিত্যক্ত ছিবড়ে থেকে। বিজ্ঞান-সচেতন ঘনাদা এখবর ভালো করেই রাখেন এবং কি করে এই তেজস্ক্রিয়তার হদিস পাওয়া যায়, কি করে সেই তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ মাপা যায় সেই যন্ত্র গেগার বা গাইগার মুলার কাউণ্টার এর সঙ্গেও বেশ পরিচিত। তাই নাৎসী জার্মানীর হয়ে প্যাপেন আর তার সঙ্গীরা যখন ইউরেনিয়ামের খোঁজে বিছে উপত্যকায় এসে পাহাড়ের ওপর ঘনাদাকে ঐ যন্ত্র সম্মুখে রেখে ম্যাপ আঁকতে দেখে

শিল্পী নারায়ণ দেবনাথের চোখে ঘনাদা

দ্বিতীয়বারের মহাকাশ যাত্রায় ঘনাদার সঙ্গী বাঁদিকে বটুক ও ডান দিকে সুরঞ্জন। মাঝখানে ঘনাদা। আর সিঁড়ির উপরে উন্মাদ বৈজ্ঞানিক লুটভিক। যেবার ঘনাদা মঙ্গলগ্রহে পেঁছে আবার নিরাপদে পৃথিবীর বুকে ফিরেও এসেছিলেন কাঠপোড়া ছাইয়ের কল্যাণে।

তেজোবেগুনে জ্বলে উঠল তখন ঘনাদার পক্ষে তাদের মতলব আঁচ করতে কষ্ট হ'ল না। জার্মেনী তখন অ্যাটম্ বোমা বানাবার চেষ্টা করছে। তার জন্য তার দরকার প্রচুর ইউরেনিয়াম জাতীয় তেজস্ক্রিয় মৌল। ঘনাদা সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেললেন। তিনি ওদের বাধা দেবেন।

কিন্তু ওদিকে আফ্রিকান সর্দারের ভুল বোঝাবুঝির ফলে যখন জংলীদের হাতে প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কুলিরা প্যাপেনকে পিছমোড়া করে বেঁধে তার জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে, আর প্যাপেনের সঙ্গীরা প্যাপেনের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর তার যন্ত্রপাতি কেড়ে নিয়ে নিজেরাই চলে গেছে ইউরেনিয়ামের সন্ধানে, তখন ঘনাদা যে কান্ডটা করলেন তা শুনতে সামান্য হলেও অভাবিতপূর্ব। এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন তিনি। প্যাপেনের যে সঙ্গীরা যন্ত্রপাতি নিয়ে ইউরেনিয়ামের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে তারা ইউরেনিয়াম খনির সন্ধান নিশ্চয়ই জেনে ফেলবে আর কি পরিমাণ ইউরেনিয়াম ওখানে আছে তারও আভাস ঘনাদা ইতিমধ্যেই জানতে পেরে গেছেন। তাদের বাধা দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকেও মুক্ত করতে হবে।

দিছে উপত্যকাটা শুকনো ঘাসের জঙ্গলে ঢাকা আর সারাদিন সেখানে উত্তর-পূর্ব থেকে একটা জোরো হাওয়া বয়ে যায়। সেই ঘাসবনে কোন রকমে আগুন ধরিয়ে দিতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হতে পারে। তার জন্য চাই একটা দিয়াশলাই।

কিন্তু না, দিয়াশলাই নেই। প্যাপেনের কাছে যেটা ছিল তার শেষ কাঠিটাও সে চুরুট জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে।

এখন কি করা? হঠাৎ ঘনাদার বিজ্ঞানী মনে জেগে উঠল সেই লেন্সের কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তাঁর দূরবীনের একটা লেন্স আচমকা খুলে পড়ে গিয়েছিল, তিনি সেটা পকেটেই পুরে রেখেছিলেন। তবে আর ভাবনা কি? চকিতে লেন্স বার করে নিয়ে তার ওপর সূর্যের আলো ফোকাস্ করে ঘাসবনের দিকে ধরলেন ঘনাদা। পরমুহূর্তেই দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন সামনের একটা ঘাসের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ঘাসবন,—না, যেন সমস্ত ঘাসবনটাই জ্বলন্ত রূপ নিয়ে সহস্র সাপের ফণা দুলিয়ে ছুটে চলল হাওয়ার সঙ্গে দিগ্বিদিকে।

যে জংলীরা আসছিল আক্রমণ করতে তারা প্রাণভয়ে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই আর ইউরেনিয়াম-সন্ধানী নাৎসীদেরও আর ইউরেনিয়াম খনি উদ্ধার করা সম্ভব হ'ল না।

এছাড়া আরও কত রকম গল্প! তুষার রাজ্যে তুষার-মানব ইয়েতির সঙ্গে মোলাকাৎ, তিমি-ধরা জাহাজে করে মেরু-অঞ্চলে গিয়ে মোম-তিমি শিকার, সেখানে পেঙ্গুইন পাখিদের হালচাল পরিদর্শন তার পর গিরিগহ্বরে আটকা পড়ে ছাড়ির সাহায্যে জমে থাকা গরম গ্যাস বার করে নিয়ে পোর্টেবল তাঁবু দিয়ে বেলুন বানিয়ে সেই হালকা গরম গ্যাস বেলুনে পুরে বেলুনের সাহায্যে উড়ে গিয়ে উদ্ধার পাওয়া—এই রকম কত কি! কিছুটা আজগুবি মনে হলেও এগুলি সবই ঘনাদার বিজ্ঞান-মানসিকতার সাক্ষ্য বহন করছে। এমন কি বাইরের অজানা গ্রহ থেকে আসা উড়ন্ত চাকীর কাহিনীও বাদ যায় নি।

* * * *

তাই বলছিলাম, ঘনাদা বিজ্ঞানী না হয়েও বিজ্ঞানী, নিজের হাতে আবিষ্কার না করেও আবিষ্কারের সমঝদার। তাঁর সমস্ত গল্পই কল্পিত, কিন্তু তার ভিতরকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি অস্বীকার করব কি করে?

16, টাউন সেন্ড রোড, কলিকাতা-700025

রহস্যের কোন মীমাংসা করা গেল না। ঠিক হোল- মাসখানেক বাদে বিক্রীর দলিল রেজেস্ট্রি করা হবে। এরপর আমি এলাম নিউপোর্টে, ম্যাকের বাড়ীতে।
ম্যাক, আমায় কিছু টাকা ধার দিতে পারো? লাখ দেড়েক ডলার।
এতো টাকা পাবো কোথায়?
বেশ, আমায় একটা ওকালতনামা দাও। তোমার পক্ষে লাখ দেড়েক ডলার নেবার।
বেশ, তা দিচ্ছি।
কথা রইলো- দলিল লেখা হবে কমাদ্বীপের আস্তানায়। আমি ফিরে আসারপর। এরপর প্রায় মাসখানেক আমাকে ঘোরাঘুরি করতে হোল প্রচুর। তারপর ফিরে এলাম নিউপোর্টে। সেখান থেকে কমায়--
আমাদের স্টিমার যখন কমাদ্বীপের কাছে পৌঁছলো--
একি! ওই স্টিমার দুটো কাদের? এখানে কেন?
কার হুকুমে এখানে এসেছে?
ধরুন, আমারে। একটা এসেছে ফেনা ছড়াতে, আর একটা মাটি খুঁড়তে।
তার মানে?
ঐ ফেনা ছড়িয়েই এই জোড়া দ্বীপের অপদেবতাকে তাড়ানো হয়েছে। এখানকার সমুদ্রে আবার মাছের গুঁতোগুঁতি শুরু হয়েছে। তবে অপদেবতাকে বিদায় করতে একটু খরচও হয়েছে।
ফেনা ছড়ানোর খরচ পড়েছে প্রায় দেড় লাখ ডলার।
এতো টাকা-আমি শোধ দেব কী করে?
শোধ দিতে হবে না। তোমার এই জোড়া দ্বীপে মাটি খোঁড়ার ইজারা যারা নিচ্ছে, -তারাই ও দেনা চুকিয়ে আরও লাখ দুয়েক ডলার তোমাকে দেবে ম্যাক। ওটা বায়না।
5

কী বলছো তুমি?
হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। শোন ম্যাক, তোমার এই ছোট্ট দ্বীপের ভেতরকার মাটি সব পি ডি 46, আর 106·7। কিন্তু ওদের 76, আর 190·83 আছে।
সেই রাতেই একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। এবারও আমি একা ছিলাম তাঁবুতে। রাত তখন প্রায় দুটো। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।
আসুন, আসুন মিঃ ফুগান, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।
আমার জন্যে! কেন বলুন তো?
বাহ, আপনার বন্ধুকে বাঁচিয়ে দেবার জন্যে আমায় ধন্যবাদ দিতে আসবেন না? বড় ভেবেছিলাম-আপনি সাঁতরেই আসবেন?
যেমন সে রাতে আপনি গিয়েছিলেন?
ঠিক। এসব কাজ চুপিচুপি সারাই ভালো নয় কি! দেখেছেন তো - চুপিচুপি আপনার ঘরে ঢুকে নোটবই খুলে ওসব যে কথন লিখেছি, আপনি জানতেও পারেননি। অথচ আপনি এলেন মোটরবোটে, কাজেই টের পেয়ে গেলাম।
টের পেলেই বা কী করবি? কেবে উড়িয়েছে কোথাকার!
আজই তোর শেষ। এখনি তোর লাশটা বোটে বেঁধে ওটা ডুবিয়ে দেবো সমুদ্রের জলে। ও পিডি 46 আমার আবিষ্কার। আমিই ওর মালিক।
খুব হয়েছে, সাধীর এবার ছাড়ুন।
আর দেখুন, আপনার মালিকানা কদ্দুর গড়ায়!
৬

ওইভাবেই থাকুন। এ গলা টিপে কিছু করা যায় না, বুঝেছেন? যোগব্যায়ামের ফল। এখন আসল কথাগুলো শুনুন।
আঁইইই.....
উঃ.....
বছর পাঁচেক আগে আপনি এখানে এসেছিলেন। আপনার গ্লিসেরাইডস-এর কারখানা আছে। এখানকার মাটিতে যে আয়রন পি ডি অর্থাৎ প্যালেডিয়াম আছে, তা জানতে পারেন আপনি। নমুনা পরীক্ষা করিয়ে জানতে পারেন—অসমিয়াম অর্থাৎ ও এস-ও আছে। প্যালেডিয়াম-এর অ্যাটমিক নম্বর 46, অ্যাটমিক ওজন 106.7, অসমিয়ামের অ্যাটমিক নম্বর 76, ওজন 190.5।
গ্লিসেরাইডস-তৈরির কাজে প্যালেডিয়াম-এর চেয়ে সেরা ক্যাটালিস্ট আর নেই। অত্যন্ত দামী বলে এ ধাতুর বদলে আপনারা নিকেল ব্যবহার করেন। প্যালেডিয়াম এখানে আছে দেখে আপনি দ্বীপটা হাতাবার এক অদ্ভুত ফন্দী বার করেন। উত্তর বিষুব স্রোত এই দ্বীপটার প্রায় মাঝখান দিয়ে ঘুরে যায়। আপনি সস্তা পেট্রোলের গাদ কিনে দ্বীপের পুবের দিকে কোথাও ঢালার ব্যবস্থা রেখেছেন। সে তেল সমুদ্রের জলের উপর ঢাকা সরের মতো ভেসে এসে এই দ্বীপটিকে ঘিরে জমতে শুরু করেছে। সরের জন্য সমুদ্রের আণুবীক্ষণিক জীব প্ল্যাঙ্কটন বাঁচতে পারেনি অক্সিজেনের অভাবে।
প্ল্যাঙ্কটন যাদের আহার সেই ছোট মাছ, পোকা, সব মারা গেছে। তারপর ধাপে ধাপে এই মৃত্যুর ঢেউ বিরাট সব জলচরদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছেছে। খাবারের অভাবে মাছ আর পাখীরা দ্বীপটাকে ছেড়েছে।
কিন্তু এতো শয়তানী প্যাঁচ সব এক ফেনাই ভেস্তে দিলে।
কী ফেনা?

তেলবোঝাই জাহাজ চালিয়ে আর কল-কারখানার নোংরা জঞ্জাল নির্বিচারে ঢেলে সমুদ্রটাকে এমনিতে বিষ করে তোলা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা তাই সমুদ্রকে নির্মল করবার জন্যে যে সব উপায় বের করছেন, তার একটি হোল ঐ ফেনা। ও ফেনাকে কুচানো পলিউরেথেন বলতে পারেন।
বিলেতের একটি কোম্পানী ওটি আবিষ্কার করেছে। জলের উপর ছড়ালে তেল শুষে নিয়ে ওই ফেনা কালো হয়ে যায়। তখন অনায়াসে ওটাকে জলের উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে কোথাও জমা করা হয়। ওটাকে নিংড়ে নিয়ে আবার তেল বের করে নেওয়াও শক্ত নয়।
আমার লাশটা আপনি বোটে নামালেন, ঠিক করেছিলেন। আমি কিছু জ্ঞান করবো না।
এখান থেকে সোজা চলে যান সেন্ট টমাস দ্বীপ। সেখান থেকে আমেরিকা। খবরদার, মামলের ছায়াও আর মাড়াবেন না। আপনি বোটটা নিয়ে যান। আমি সাঁতরেই কমা দ্বীপে ফিরে যাবো।
টঙের ঘরে ফিরে গেলেন ঘনাদা। আমরা অবাক। এতাবে যে আমাদের মাপ করে দেবেন, কে জানতো?
এমন সময় বনোয়ারী এসে হাজির।
কীরে, তপসে মাছ পাসনি?
পাইয়েছে না কী রকম?
হামি গিয়েছে, আর মাছ মিলবে নাই? আমি বাস-সে নামলাম। আর বড়বাবু উধার দিয়ে যেতে যেতে হামাকে দেখলে। তারপর আমার মছলি সব ভালো করে দেখে তবিয়ত করলে।
বড়বাবু—মানে ঘনাদা। জলের গন্ধ আর তপসে মাছের মধ্যে কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে নাকি?

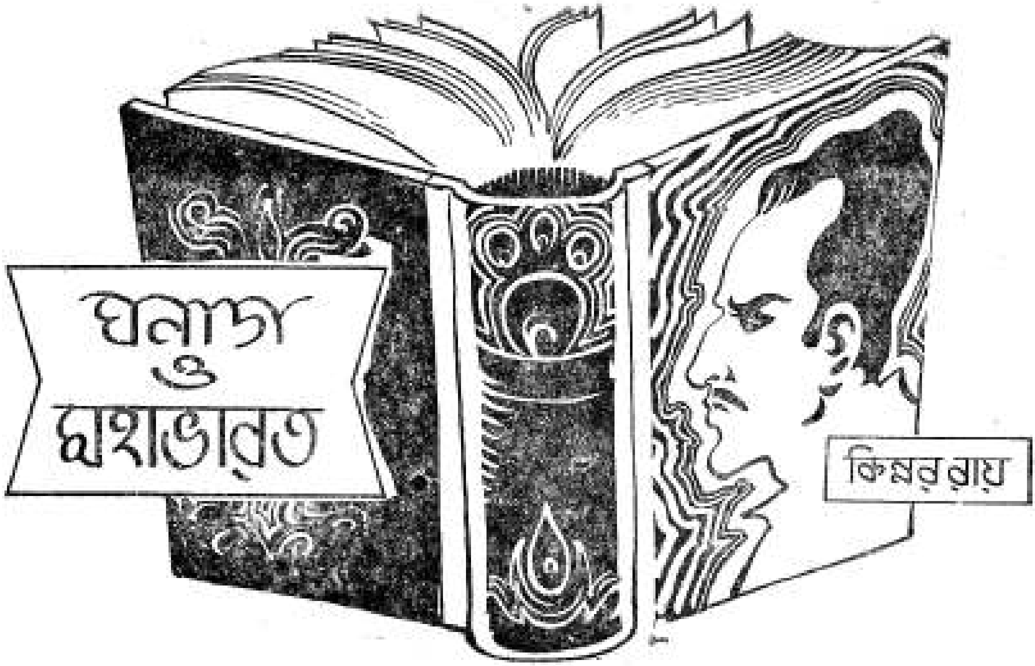

ঘনশ্যাম দাস ভনে…

72 নম্বরের সেই বিখ্যাত টঙের ঘর থেকে কতদূরে হস্তিনাপুর, আর কতটাই বা কুরুক্ষেত্র ? ধাঁধা হিসেবে প্রশ্নটি একটু হয়ত জটিল । কিন্তু গোটা পৃথিবী, এমন কি পৃথিবীর বাইরেটাও যাঁর কাছে এক টিপ নস্যি, সেই মহামহিম প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস যে সহজেই মহাভারতের চালচুলো ভেঙে এক নিজস্ব মৌরুসিপাট্টা তৈরি করে নেবেন এতে আর আশ্চর্য কি ! কাহিনী আর পয়ারের প্যাঁচ পয়জার ফেলে দিয়ে গুছিয়ে বসিয়ে দেবেন নিজের যুক্তিখানি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দিয়ে, এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে !

এবার একটু বিষয়ে আসি। সম্পাদক বলেছিলেন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘনাদা সংখ্যার জন্যে 'মহাভারতে ঘনাদা'—এ নিয়ে কিছু লিখে দিতে। কিংবা ব্যাপারটা এরকমও হতে পারে 'ঘনাদা ও মহাভারত ।'

বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ভূগোল-মনস্ক ঘনাদা যেভাবে সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্রটাকে মাথার ভেতর পুরে বেড়িয়েছেন, তেমনি পুরাণ-মনস্কতায় তিনি নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন এই মহাকাব্যের—মহাভারতের। আর এটাই তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। একটা চালু কথা অনেকদিন শুনতে শুনতে চেনিয়ে গেছি—'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।' অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই ভূ-ভারতে হাজার খুঁজলেও তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বাজারচলতি কথাটিরও মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ছেড়েছেন অনেক ঘটনা এবং অ-ঘটনের নায়ক ঘনাদা।

ধরা যাক, 'শান্তি পর্বে ঘনাদা'-কাহিনীটি। আমরা জানি আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, সৌপ্তিক, ঐষীক, স্ত্রী, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মুষল, স্বর্গারোহণ—মোট আঠারোটি পর্ব মহাভারতের। 'শান্তি পর্বে ঘনাদা'য় আমরা দেখতে পাই হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর দেশের ছবি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরের সেই ভারতবর্ষে রাজা আছে, রাজপাট আছে, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা, বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে, যেন আজকেরই ভারতবর্ষ বা তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশ। ইঁদুরের চেহারা বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছে ধেড়ে বরার সমান। কলেবর স্ফীতির কারণ ঘুষ। বাঁ হাতে নগদ নারায়ণ না গুঁজে দিলে কোন কাজই হয় না। সমস্ত রকম লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্য, দেয়া-নেয়া নীতির ওপর দাঁড়িয়ে, এমনই রাজ্যের অবস্থা। সেখানে যুধিষ্ঠিরের সভায় যখন রাজানুগ্রহী ব্রাহ্মণেরা নানান উপাচার পেয়ে শুধুই রাজার বন্দনা করছেন, তখন চার্বাক ঢুকলেন।

'জয়দ্রথ বধে ঘনাদা'য় আমরা ঘনাদাকে দেখি শুধু পুরাণবেত্তা বা মহাভারতের নব-ভাষ্যকার হিসেবেই নয়, তাঁকে আমরা পেয়ে যাই একজন বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবেও। ঘনাদার কথা অনুযায়ী জয়দ্রথ বধের যে প্রতিজ্ঞা অর্জুনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তা আসলে অর্জুনের কথা নয়। শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন প্রতিজ্ঞা-বাক্য।

এখানে ঘনাদার ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী (এস্ট্রোনমার)। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিক্রমা, গতি—সমস্তই তাঁর নখদর্পণে। তিনিই আসলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে হত্যা করবেন। কারণ তাঁর হিসাব মতো পরদিনই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। ঘনাদার ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুদর্শন চক্রে সূর্যকে ঢেকে ফেলেননি শ্রীকৃষ্ণ। গ্রহণের নিয়ম অনুযায়ী সূর্য আপনিই মুখ লুকিয়েছিল ছায়ার পেছনে। আর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী অর্জুন জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ-ত্যাগ করবেন—এই আনন্দে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এসেছিল জয়দ্রথ। তারপরই অর্জুনের বাণে তার গলা পড়ল কাটা। আর বাণে বাণে সেই মুন্ডু উড়ে গিয়ে পড়ল জয়দ্রথেরই বাবার কোলে। তখনই সূর্য উঁকি দিল আকাশে। সুদর্শনে সূর্য ঢাকার উপাখ্যান থেকে গ্রহণের হিসেব কষে জয়দ্রথ আর কৌরবদের প্যাঁচে ফেলা ব্যাপারটা অনেক বাস্তবসম্মত। সেখানেই কাশীরাম দাস কাত, ঘনশ্যাম দাসের জিত।

তিন নম্বর গল্প 'ঘনাদার শল্য সমাচার'।

যুধিষ্ঠিরের হাতে শল্য কিভাবে নিহত হলেন, এখানে তার ব্যাখ্যা। মহাভারতের কাশীদাসী পয়ার সামান্য পাল্টে ঘনাদা বলছেন যুধিষ্ঠিরের বাঁদিকে নকুল, সহদেব ছিল না। ছিল দু পাশে। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের শেখানো মত করুণ গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল নকুল সহদেব, শল্যের আপন ভাগ্নেরা—'মামা, মামাগো!' যেন মামার বাণে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে দুই ভাগ্নের এই চিৎকার, শেষ আর্তনাদ। ব্যাস, আপন ভাগ্নে নিজের মায়ের পেটের বোন মাদ্রীর দুই ছেলে এমন করুণ কণ্ঠে ডাকছে কেন ভাবতে গিয়েই শল্য হয়ে পড়লেন অন্যমনস্ক। আর সেই সুযোগে যুধিষ্ঠিরের বাণ তাঁকে পেড়ে ফেলল। ঘনাদার কথা অনুযায়ী যুধিষ্ঠির অবশ্য জানতেন না শ্রীকৃষ্ণের এই চাতুরি। স্বজনের প্রতি দুর্বলতা—মানবচরিত্রের এই দিকটি নিয়েও ঘনাদা একচোট মুচড়ে দিলেন কাশীরাম দাসকে। এবারেও ঘনাদার ব্যাখ্যার কাছে কাশীরাম হেরে গেল।

এখানেই শেষ নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলাফল কেন পান্ডবদের পক্ষে গেল তা নিয়ে ঘনাদার বিশ্লেষণ প্রায় বিশ্বকাপ বিজয়ী ফুটবল দলের কোচের মত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠারো না উনিশ দিনের তা নিয়ে ঘনাদার সিদ্ধান্ত, যুদ্ধ হয়েছে আঠারো নয় উনিশ দিন। কারণ, যুদ্ধের আগের দিনই কুরুক্ষেত্রের পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো জায়গাটার দখল নিয়ে পান্ডবরা যুদ্ধের ফলাফলকে প্রায় নিজেদের কব্জা করে নিয়েছিল। খান্ডবদাহে শ্রীকৃষ্ণের প্যাঁচ তো ভোলার কথা নয়। কিভাবে বোকা বানালেন অগ্নিদেবকে, সে কাহিনী যেমন অনুপম, তেমনি অসামান্য। কুরুক্ষেত্রে ভগদত্তের সম্পূর্ণ বলবীর্য না দেখতে পারার কারণ নিয়ে ঘনাদার ব্যাখ্যা, দুর্যোধনের শ্যালক উলুকের ব্যবহার ও মুষখোরি স্বভাব। ভগদত্তের হাতি ক্ষিরিয়ে দেয়া এবং যাবতীয় বাজে মাল নিয়ে কৌরবদের যুদ্ধ চালানো যে যাবতীয় গন্ডগোলের কারণ সেকথাও আবিষ্কার করলেন ঘনাদা। সত্যই তার জুড়ি নেই।

এতসব লেখালেখির পর মহাভারতে যা নেই, অথচ হয়েছিল এমন আরও কিছু ঘটনার সুলুক নিতে দুরু দুরু বক্ষে হাজির হয়েছিলুম 72 নম্বরের টঙের ঘরে। শিশির, শিবু, গৌর কারুর সঙ্গেই দেখা হলো না। সকলেই বোধহয় খুব ব্যস্ত। কাউকে কোথাও না দেখতে পেয়ে বনোয়ারিকেই শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার, আছেন নাকি উনি? বনোয়ারি বাংলা মেশানো হিন্দিতে যা বলল, তার অর্থ দাঁড়ায় এইরকম—কয়েকদিন থেকেই ওপরের ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই তেমন। খাবার-দাবারেরও.......

আমার আর তর সইল না। হুড়মুড়িয়ে ওপরে উঠে এসে দেখলাম টঙের ঘরে মস্ত তালা। সামনে দরজার ওপর সাদা কাগজে লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা।

'হ্যালিকে হ্যালো করতে
ঠিক ঠিক ফলো করতে
যাচ্ছি
কয়েকদিন গবেষণা দেখাদেখা
ষোলো আনা শেষ করে
ফিরছি।'

ঘনাদা হ্যালির ধূমকেতু দেখতে কোথায় গেলেন, আপাতত কেউ জানে না। কবে ফিরবেন তাও বোধহয় না। তিনি কি ধূমকেতুর সঙ্গে মহাভারতের কোনো যোগাযোগ খুঁজে পেলেন। যুদ্ধ-ধূমকেতু বিজ্ঞান—সব মিলিয়ে কি দাঁড়ায়, তাই দেখার জন্যেই কি এই অভিযান? নাকি তাঁর এই বেরিয়ে পড়া মো-কা-সা-বি-স-এর চ্যালেঞ্জের উত্তরে?

খুব মন খারাপ নিয়ে ফিরে আসা।

নামার আগে টঙের ঘরের দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে এলাম ভালো রসোমালাই এক হাঁড়ি, অবশ্যই বাগবাজারের, আর দামি সিগারেটের একটা প্যাকেট। এখন তো আর টিন মেলে না বাজারে। এসব তাঁর জন্যেই নেয়া ছিল।

সাদা কাগজের ওপর কালো কালিতে দুটো লাইন রসোমালাইয়ের কাগজের ঢাকনায় পিন দিয়ে গেঁথে এসেছি নেমে আসার আগে। জানি না তা ঘনাদার হাতে এতদিনে পৌঁছে গেছে কিনা।

আসলে যে কথা তাঁকে বলতে গেছিলাম তারই সার-বস্তুটুকু এ দু লাইনে—

নব (মহা)-ভারতের কথা অমৃতসমান
ঘনশ্যাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান

1এ মুখার্জি পাড়া লেন, কল-26

ঘনাদা ও বিশ্বের নেতৃবর্গ

জয়ন্ত দত্ত

তামাম বিশ্বের নেতৃবর্গের সঙ্গে ঘনাদার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে ! তবে যোগাযোগ থাকলেও তো আর আমাদের জানার সুযোগ নেই। ঘনাদা নিজের থেকে আগ বাড়িয়ে সে সব কথা বলতে লজ্জা পান। আর যোগাযোগের কারণ তো রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানের জন্য মুশকিল আসান ঘনাদার শরণাপন্ন হওয়া। তাই সেসব কথা ফলাও করে বাইরে বেরোবারও সুযোগ তেমন নেই।

রুজভেল্ট কি আইসেন-হাওয়ার তাঁকে কোন দায়িত্ব দিয়ে থাকলে তা চিরকাল গোপনই থেকে গেছে। কিন্তু ঘনাদার কর্মক্ষেত্রের পরিধি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, জার্মানীর চ্যান্সেলার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল গভীর। এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের নেতৃবর্গের সঙ্গেও তাঁর রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল। তবে ঘনাদা সেসব কথা প্রকাশ করেননি লজ্জায়।

যে অসাধারণ যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঘনাদা বিচরণ করেন তাতে তাঁকে যে মুশকিল আসানের জন্যে সকলের প্রয়োজন হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। স্বভাবলাজুক ঘনাদা নিজের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে কোন দিনই নিজের মুখে কিছু বলেন নি। অথচ তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে বহু ভাষায় কথাবার্তা চালিয়ে যান। প্রাচীন সংস্কৃত, ল্যাটিন ছাড়াও তিনি সবকটি ভারতীয় ভাষা, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, চীনা, রুশ, তিব্বতী, জাপানী, সোহাহিলি আরবী, ফারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় সমান দক্ষতার সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারেন, লেখালিখি করতে পারেন। রিভলবার সঙ্গে থাকলেও সেটি ব্যবহারের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। মাত্র কয়েকটি স্বদেশী প্যাঁচেই তিনি দুর্বৃত্তদের মোকাবিলা করে থাকেন। এ হেন ঘনাদাকে যে বিশ্বের কূটনীতিবিদদের প্রয়োজন হবে বিভিন্ন কারণে এতে অবাক হবার কিছু নেই। ঘনাদা তো নিজের প্রয়োজনে তাঁদের কাছে যান নি কখনো। তাঁরাই বরং বিভিন্ন দরকারে গোপনে ঘনাদাকে ডেকে নিয়ে গেছেন। ভারত সরকারও ঘনাদাকে ইন্টারন্যাশনাল পাশপোর্ট দিয়ে ধন্য হয়েছেন।

গোপন কাজে ঘনাদা যখন বাইরে যান নিজের পরিচয় তিনি সাধারণত দিয়ে থাকেন ব্যবসায়ী বা পর্যটক হিসেবে। স্রেফ নিজেকে গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করার মহাদায়িত্ব ভার রয়েছে তাঁর মাথায়। দুষ্ট দমনের আগে ঘনাদা অবশ্য নিজের আসল পরিচয়টি তাকে দিয়েছেন। এ '—অধীনের নাম ঘনশ্যাম দাস।'

বৃটিশ সরকারের গোপন নির্দেশ পেয়ে ঘনাদা আট-লান্টিক মহাসাগরের তলদেশের গোপন মানচিত্র চুরির দুরভিসন্ধিকে বানচাল করেন। অসামান্য বৈজ্ঞানিক নর্মান জোয়ার্কিমকে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার সুযোগ ঘনাদাই করে দিয়েছিলেন। এটা যে তিনি করতে পেরেছিলেন তার জন্য অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সরকার যৌথভাবে ঘনাদার কাছে কৃতজ্ঞ। চাকরী করার ছুতোয় দক্ষিণ

শিল্পী ধীরেন বলের চোখে ঘনাদা

হুলো বেড়ালের ডাককেই ঘনাদা শুনে তিনি অর্সিন্যাল অর্কা'র ডাক বলে যদি ভুল না করতেন তা হলে আমরা ঠগবাজ কাউন্ট কার্পেরা'র কথা জানতে পারতাম না। ঘনাদা তখন আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে স্যামন মাছ শিকারী জেলেদের এক সর্দারের অতিথি হয়ে আছেন। হঠাৎই টেলিগ্রাম এল………

ডান দিকে জেলে সর্দার বাঁ দিকে ঘনাদা

আফ্রিকায় গিয়ে ঘনাদা হের ফিংকের কারাকুল ভেড়া চুরির কু-মতলব বানচাল করেছেন।

তাইওয়ান সরকারের অনুরোধে ঘনাদা চিংহুনকে দলবল-সহ সলিল সমাধি দেন। তাঁর এই মহৎ কাজের জন্যেই লুপ্তপ্রায় সাগর ডৌবিড়ের অস্তিত্ব থেকে গেছে। বাঁশবন্নমোরির মধুর অদ্ভুত আচরণ ঘনাদার পক্ষেই জানা সম্ভব।

মহাসাগরের বুকে যখন কোন অজ্ঞাত কারণে জাহাজে পরপর বিস্ফোরণ শুরু হয় তখন জাপান সরকার দিশেহারা হয়ে গোপনে ঘনাদার সাহায্য প্রার্থনা করেন। জাহাজে যে গোপনে আণবিক ঘড়ি পাচার হচ্ছিল ঘনাদাই তা গোপন অনুসন্ধান চালিয়ে বের করেন। তারপর দুষ্টচক্র ধ্বংস করে সেই সব ঘড়ির সলিল সমাধি ঘটান। তা না হলে আরেকটা নাগাসাকি-হিরোসিমা ঘটে যেতে পারতো।

ঘনাদা লাজুক স্বভাবের মানুষ। নিজের প্রচার নিজে চান না। তা না হলে বিশ্বের তাবড় তাবড় নেতৃবর্গ যাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে বা কর্মসূত্রে আবদ্ধ, যাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে বহু সুকর্মই অসম্পূর্ণ থেকে যেত, তিনি ইচ্ছে করলেই কি আর নিজের দেশের রাষ্ট্রনায়ক হতে পারতেন না। নিশ্চয়ই পারতেন। নেহাতই তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হাইতি দ্বীপে তাঁর বন্ধুর কাছে যে কখনো রাজনীতির নোংরামিতে নিজেকে তিনি জড়িয়ে ফেলবেন না।

ঘনাদার দেখা পাওয়া

অরিজিৎ দত্ত

জুড়ি নাই ঘনাদার
প্রতিভার কথা তাঁর
পাই বই পড়ে।
তবু আশ মেটে নাই
আরো কিছু পেতে চাই
ছুটি তাঁর দোরে।
রাস্তাটা গুলেট
হচ্ছিল খুব লেট
ব্যাপারটা বোঝ।
ছিল এক তস্কর
বনমালী নস্কর।
রাস্তার খোঁজ।
কবে কোন ঘোর রাতে
মুখ ঢেকে বোরখাতে
হয়েছিল বের।
বাড়ী সেই রাস্তায়
ঘনাদার বাস তায়
ভাগ্যের ফের।
হাসি আমি প্রাণ খোলা,
খেয়েছিলে কান মোলা
তুমি তাঁর হাতে?
চোর বলে, রাম রাম
তাঁকে দেখে নামলাম
সোজা রাস্তাতে।
জেনে রাখ বাড়ী খোঁজা
নয়তো হে ভারী সোজা
হদিস না দিলে।
গলি ঘুঁজি ডানে বাঁয়
পড়ে যাবে ঝামেলায়
চমকাবে পিলে।
শুনে নির্দেশ তার
খুঁজে পাই মেস তাঁর
কড়া নাড়ি জোরে।
রামভুজে আসে নেমে
শিশিরদা পাশে থেমে
দেখা দিল দোরে।
কি ব্যাপার কাকে চাই?
আমি বলি, তাঁকে ভাই
পাব তাঁর দেখা?
উত্তরে শুনি হায়
তিনি ভোরে ম্যানিলায়
যান চলে একা।